

সূচিপত্র

প্রথম অংশ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়- বিষয়জ্ঞান

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পরিচিতি	
অধ্যায় ২	আমাদের পরিবার, বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় এলাকা	
অধ্যায় ৩	পরিবেশ	
অধ্যায় ৪	মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি	
অধ্যায় ৫	পৃথিবী: মহাদেশ ও মহাসাগর	
অধ্যায় ৬	বাংলাদেশের ইতিহাস	
অধ্যায় ৭	বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ	
অধ্যায় ৮	মানচিত্র : অঙ্কন ও ব্যবহার	
অধ্যায় ৯	বাংলাদেশের সম্পদ, শিল্প ও বানিজ্য	
অধ্যায় ১০	বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি	
অধ্যায় ১১	বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য	
অধ্যায় ১২	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	
অধ্যায় ১৩	অধিকার, দায়িত্ব ও মানবাধিকার	
অধ্যায় ১৪	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা	
অধ্যায় ১৫	জনসংখ্যা সচেতনতা	

অধ্যায় ১

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পরিচিতি

ধারণা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়টি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের (যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ইত্যাদি) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রচলিত ‘সোশ্যাল স্টাডিজ’ -এর অনুরূপ। সোশ্যাল স্টাডিজ বা সামাজিক বিজ্ঞানের মতো এটি বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক বিষয়াবলির সমন্বিত একটি বিষয়। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে ২০১১ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ‘পরিবেশ পরিচিতি সমাজ’ বিষয়টির নাম পরিবর্তন করে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেও প্রচলিত ‘সামাজিক বিজ্ঞান’ বিষয়টির নাম রাখা হয়েছে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে সি-ইন-এড কোর্সের ‘পরিবেশ পরিচিতি সমাজ’ বিষয়টি ডিপিএড প্রোগ্রামে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ নামকরণ করা হয়েছে। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়টির তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

- ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে বিষয়বস্তু ধারণ করে একটি সমন্বিত বিষয়ে রূপলাভ করেছে।
- এ বিষয়টির মাধ্যমে শিশুরা বাংলাদেশের উন্মেষ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। একই সাথে শিশুরা বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথেও পরিচিত হয়।
- ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ শিশুদের সামাজিক দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে সমাজে বসবাসের সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করে।

একটি সামাজিক দলের সদস্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসের দক্ষতা অর্জন করতে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সাথে জীবনভর দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়ে ওঠার সূচনা হয় প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে। আজকের পরিবর্তনশীল ও আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বের সাথে শিক্ষার্থীদের খাপ খাওয়ানো এবং বিশ্ব পরিসরে তাদের কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণে সামর্থ্য করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জন ও বিকাশ সাধন ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়টির অন্যতম লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ একটি সমন্বিত বিষয়। এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন সামাজিক ও মানবীয় বিষয়াবলি থেকে গ্রহণ করা হয়। এটি বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন না করে বরং আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমন্বিত করে পঠন-পাঠনের নীতি মেনে চলে। এভাবে পঠন-পাঠনের তাৎপর্য হলো, শিক্ষার্থীরা তা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং একটির সাথে অপরটির আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ এভাবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ও সমৃদ্ধ ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে। যেমন-‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’-এর অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে তারা বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে পারবে। তারা আরো অনুধাবন করতে পারবে যে, কীভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানের ভৌগোলিক প্রভাব মানব কর্মকাণ্ডের সহায়ক বা প্রতিকূল হতে পারে। একইভাবে অর্থনীতির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের ঐ স্থানের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারণা প্রদানে সহায়ক হয়ে থাকে।

পরিসর

শিশুর নিজের জগৎ ও তার নিকট পরিবেশ থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’-এর বিষয়বস্তুর পরিসর। মানুষ, মানুষের পরিবেশ, সমাজ এবং সমাজে বিদ্যমান নানা রকম প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ও নিয়ম-নীতি ইত্যাদির বহুমাত্রিক আন্তঃসম্পর্ক এ বিষয়টির পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এর বিষয়বস্তুর পরিসর সহজ সরল করে বিন্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর নিজস্ব গণ্ডি এর বিষয়বস্তুগত পরিসর হিসেবে গুরুত্ব পায়। আর প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সাধারণত সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি ও জনসংখ্যা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় থেকে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’-এর বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়েছে। মোটকথা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শিশুদের দায়িত্বশীল দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উপযোগী বিষয়বস্তুই ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’-এ স্থান পেয়েছে। এ সকল বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সাথে মানবিক উদারতা ও মানবসম্প্রীতি সঞ্চারিত করে দেশ ও জাতির সীমাছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’-এর পরিসর ব্যাপক এবং পরিবর্তন শীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার পরিধি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠের তাৎপর্য

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়টি পাঠের অন্যতম তাৎপর্য হলো এটি শিশুর পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনে সাহায্য করে, যা পরিবেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পাঠের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সমাজে আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত। মানুষ কীভাবে সমাজ গঠন করেছে, সমাজ কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ উত্তর প্রদান করে। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দল, ব্যক্তি কীভাবে কাজ করে, কীভাবে তারা টিকে আছে এবং তাদের অতীত কর্মধারা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধারার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। এভাবে বিষয়টি আমাদের জীবন উন্নয়নের উপলব্ধি প্রদান করে এবং আমাদের পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়াও সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

মানুষের মানুষ হওয়ার ইতিহাস ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’-এর মূল কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের মানবিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ এ বিষয়ের প্রধান পাঠ্য বিষয়। শিক্ষা মানুষকে কাক্ষিত আচরণ আয়ত্ত করতে শেখায়। মানুষের পক্ষে অর্জনযোগ্য প্রায় অধিকাংশ আচরণ, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এ বিষয়ের মাধ্যমে শেখানো হয়।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পারিবারিক সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, সমাজের সদস্যদের মিথস্ক্রিয়া, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে শিশুদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়। শিশুদের জীবনযাত্রা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ আত্মস্থকরণে এবং সমাজের সদস্য ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ভূমিকা নির্ধারণে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে। এ বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে জানতে পারি এবং ভবিষ্যতের করণীয় উপলব্ধি করতে পারি। অতীতের কোনো পরিস্থিতির সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার আলোকে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ, আদর্শ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার মনোভাব সৃষ্টি করে। কীভাবে আমরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছি; নাগরিকের প্রাত্যহিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে বোঝার জন্য, রাষ্ট্রের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ভালো করে জানার জন্য এ

বিষয়টি পঠন-পাঠন একান্ত প্রয়োজন। নাগরিক হিসেবে আমাদের কী অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা আমরা ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পাঠের মাধ্যমে জানতে পারি।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সকল ধরনের বৈষম্য দূর করে অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলে এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। এ বিষয়টি গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ ও পরমতসহিষ্ণুতার উন্নয়ন এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করে। এছাড়া মাদকজাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ তথা ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করে।

বিপুল জনসংখ্যা বাংলাদেশে পরিবেশ, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিনোদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তারপরও দেশে লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ভবিষ্যতে সার্বিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব হবে আরো নেতিবাচক। শিশুদের এ সম্পর্কে সচেতন করতে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পঠন-পাঠনের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে।

আজকের পরিবর্তিত ও আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বে একজন নাগরিকের দায়িত্ব বিশ্ব পরিসরে বিস্তৃত। বিশ্বের নাগরিক হিসেবে মানুষকে ভালোভাবে সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ শিক্ষার্থীদের এসব দায়িত্বের সাথে সুপরিচিত করে তোলে। এছাড়া তাদেরকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে। অর্থাৎ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধজাগ্রত করতে এবং ভূমিকা পালনের মনোভাব তৈরিতে ও ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা একটি বিশ্ব সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে। সর্বোপরি শিশুদের ভবিষ্যৎ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও পেশাগত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ২

আমাদের পরিবার, বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় এলাকা

পরিবারের ধারণা

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি— মা, বাবা, ভাই, বোন নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। এটি পরিবারের একটি সরল ধারণা। সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধারণার বাইরে আরো ব্যাপক পরিসরে পরিবারকে দেখে থাকেন। কেউ কেউ জৈবিক কাজের নিরিখে পরিবারের ধারণা উপস্থাপন করেন। যেমন—সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, ‘পরিবার হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী, যাকে সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যায়। এটি সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও তাদের লালন-পালনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান’ (সেন, রঙ্গলাল ও নাথ, ২০০৭, পৃ. ২২৯)।

আবার অনেকে শুধু সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের ধারণার মধ্যে পরিবারের সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কারণ পরিবারে সন্তান-সন্ততি যেমন থাকে, তেমনি সন্তানহীন পরিবার সন্তান দত্তক নিতে পারেন। অনেক পরিবারে মা-বাবার বা স্বামী-স্ত্রীর রক্তের সম্পর্কের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বা বাইরের লোকজনও থাকতে পারে। কাজেই দেখা যায়, পরিবারের ধারণাটি পূর্বোক্ত সংজ্ঞার চেয়েও ব্যাপকতর। বর্তমানে ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পরিবার সম্পর্কিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, পরিবার একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন বা সংঘ। তবে এর সর্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলতে পারি, ‘পরিবার বলতে বোঝায় এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যেখানে বৈবাহিক এবং রক্ত সম্পর্ক সূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্তানাদির স্ত্রী-পরিজনসহ বসবাস করে’ (রহমান, ২০১০, পৃ. ৬২)। অনেক ক্ষেত্রে চাচা-চাচি, ফুফু, দাদা-দাদি, নানা-নানি, খালা, মামা প্রমুখও পরিবারের সদস্য হিসেবে একত্রে বসবাস করে। বিভিন্ন সমাজে নানা ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে, যেমন—পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার, একপত্নী ও বহুপত্নী পরিবার, যৌথ ও একক পরিবার। কোন কোন সমাজে এক ব্যক্তি পরিবারও রয়েছে।

পরিবার গঠন প্রণালী

পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিবাহ। আদিম সমাজে বিবাহ ছাড়াই পরিবার গঠিত হতো। সাধারণত একজন পুরুষ ও একজন নারী সমাজ-স্বীকৃত উপায়ে বিয়ে করে পরিবার গঠন করেন। এটিই পরিবার গঠনের ভিত্তি। সময়ের পরিক্রমায় এ পরিবারের সংগে যুক্ত হয় সন্তান-সন্ততি। পরিবারের পরিধি কখনো থাকে ছোট, আবার কখনো বা হয় বড়। একটি পরিবার গঠন প্রণালীতে বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম-কানুন ও প্রথাও গুরুত্বপূর্ণ।



পরিবারের কাজ

সমাজের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারের অন্যতম লক্ষ্য হলো কনিষ্ঠ সদস্য তথা শিশুদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনে পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিম্নরূপ-

১. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করা : মা-বাবা বা অভিভাবকের অন্যতম কাজ হলো শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করা। শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনমত পুষ্টিমানসম্পন্ন সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করা মা-বাবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সহজলভ্য নানা প্রাকৃতিক ও দেশীয় খাবার খেতে শিশুদের অভ্যস্ত করা প্রয়োজন।

২. রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান : শিশুর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই এ বিষয়ে পরিবারকে সচেতন থাকতে হবে। জন্মের পর থেকেই বৈরী প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশুর নিরাপত্তা বিধান করা। নিরাপদ পরিবেশে জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা। রোগব্যাধি হলে দ্রুত সূচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশবান্ধব আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা। পরিবারে শিশুদের নানাবিধ বিনোদনমূলক সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. পারিবারিক অনুশাসন : স্নেহ-ভালোবাসার পাশাপাশি পরিবার শিশুকে বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের সাথে পরিচয় করায়, এতে শিশু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজে নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়।

৪. সঙ্গ দেওয়া : শিশুকে সঙ্গ দেওয়া পরিবারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুর স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের জন্য এটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত গ্রামীণ পরিবার এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করলেও অনেক শহুরে পরিবার এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে শহুরে পরিবারদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৫. মূল্যবোধ অর্জনে সহযোগিতা করা : শিশুর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে পরিবার ভূমিকা পালন করে। মা-বাবাসহ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিশু পারিবারিক মূল্যবোধ অর্জন করে। শিশুর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, আগ্রহ, অনুভূতি ও মনোভাব বিকাশে পারিবারিক মূল্যবোধ ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

৬. পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করানো : শিশুদের বয়স ও পরিণত মন অনুসারে পারিবারিক বিভিন্ন কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া ও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া মা-বাবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুর অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনেও (The UN Convention on Child Rights) শিশুর এই অধিকারের কথা বলা হয়েছে। পরিবারে শিশুর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা দরকার। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও স্বাধীনমত প্রকাশের সুযোগ শিশুকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে।

৭. অর্থনৈতিক কাজ : পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণ নানাবিধ অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত থাকেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে তারা আয়-উপার্জন করেন। আয়-উপার্জন কম থাকলে পরিবার নানাবিধ সমস্যায় পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিশুকে কাজ কর্মে নিয়োজিত হতে হয়, এতে তাদের শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৮. শিক্ষামূলক কাজ : শিশুর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা ঘটে পরিবারে। শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পরিবার প্রধানতম ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংগে পরিবারের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পরিবার শিশুর নাগরিক শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষায় ভূমিকা পালন করে।

পরিবারে শিশু সদস্যদের কাজ

পরিবারে শিশুর বেশ কিছু অধিকার রয়েছে। এসব অধিকার সাধনে পরিবারের কাছ থেকে শিশু নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা। সাথে সাথে নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে পারিবারিক বলয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুরও কিছু কাজ করা দরকার।

১. শিশুর প্রাথমিক কাজ: শিশু নিজের পড়ার টেবিল, বইপত্র, স্কুল ইউনিফর্ম, অন্যান্য পোশাক, জুতা ও খেলার সামগ্রী নিজেরাই গুছিয়ে রাখবে। নিজের শোবার ঘর ও বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখবে। প্রত্যেক শিশু সদস্য মা-বাবা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করবে। তাদের পরামর্শ বা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করবে। এছাড়া শিশু পরিবারের নিয়ম-কানুন মেনে চলবে ও মনোযোগ দিয়ে ঠিকমতো পড়ালেখা করবে।



২. অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন : শিশুরা বিভিন্ন কাজে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করবে। যেমন-পরিবারের ছোট ছোট কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করবে। শিশুরা পড়ালেখার অবসরে সম্ভবমতো পরিবারের বিভিন্ন আয় রোজগারমূলক কাজে অন্যদের সাহায্য করবে।

ছোট ভাইবোনের কাপড়, খেলনা ও অন্যান্য জিনিস গুছিয়ে রাখবে। পরিবারের নিজের ও অন্য সদস্যদের কাপড় ধোঁয়া ও শুকানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।



পরিবারে দাদা, দাদি, চাচা, ফুপু, নানা, নানি বা মামা ও খালা থাকলে তাদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবে। যেমন-তাদের অসুখ-বিসুখ হলে সম্ভবমত সেবা করবে, সময়মতো খাবার ও ওষুধ খাওয়াবে।



৩. কাজক্ষিত আচরণ : কোনো কিছুর দরকার হলে শিশুরা তা মা-বাবাকে জানাবে। এমন কোনো কিছুর জন্য তাদের আবদার করা সঙ্গত হবে না যা মা-বাবার সামর্থ্যের বাইরে। এতে তারা মনে কষ্ট পাবেন। পরিবারের সকল সদস্যের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। পরিবারে গৃহকর্মী থাকলে তাদের সাথেও ভাল আচরণ করবে। পরিবারের বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য মা-বাবাকে বা বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের জানিয়ে যাওয়া উচিত। একইভাবে বিদ্যালয় থেকে দেরি করে বাড়িতে ফেরা বা মা-বাবাকে না জানিয়ে কোথাও আড্ডা দেয়া ঠিক নয়।



৪. মতামত প্রকাশ ও সহনশীলতা :পরিবারের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মা-বাবা যখন ছেলেমেয়েদের মতামত শুনতে চাইবেন, তখন তাদের উচিত হবে মার্জিতভাবে যুক্তিসঙ্গত মতামত উপস্থাপন করা। সবার বক্তব্য শুনে মা-বাবা যে সিদ্ধান্ত নেবেন সবাই তা সম্মতিসহ সাথে গ্রহণ করবে।

বিদ্যালয়ে নিয়ম-কানুন এবং কাজ

প্রতিটি বিদ্যালয়ে কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। শিশুর জন্য এগুলো মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো শিশুদের যেমন নিরাপদ রাখতে সহায়তা করে তেমনি বিদ্যালয়ে কীভাবে লেখাপড়া ও কাজ করতে হবে সে শিক্ষাও দেয়। নিয়ম-কানুন মেনে চলা ও কাজের মধ্য দিয়ে তারা নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, আদব-কায়দা ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করে। শিশুরা স্বভাবগত কারণে মাঝেমাঝে নিয়ম ভেঙে ফেলে। কাজেই, বিদ্যালয়ে ছোট শিশুদের যথাযথ আচরণের উন্নয়ন ও অনুশীলনের জন্য শিক্ষকবৃন্দকে বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুনগুলো তাদের স্পষ্টভাবে শেখানোর প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। শিশুদের সক্রিয় সামাজিক গুণাবলি বিকশিত করার জন্য শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে নিচের ক্ষেত্রগুলোতে শিশুরা শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস করবে-

- বিদ্যালয়ে আগমন ও সমাবেশ
- শ্রেণিকক্ষ
- সহপাঠীদের ও অন্য শিক্ষার্থীর সাথে মেলামেশা
- টিফিন সময়
- বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চলাফেরায়
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে
- খেলার মাঠে
- ওয়াশরুমে
- লাইব্রেরি ব্যবহারে
- বিদ্যালয় প্রস্থানকালে

বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক নিজে যেমন এ উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার তেমনি শিক্ষার্থীদের কাজে নিয়োজিত করে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। যেমন-বিদ্যালয়ের মাঠের সংস্কার সাধন, বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধ স্থানে মাটি ভরাটের কাজ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে সরকার ও কিছু বেসরকারি সংস্থা অনেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। শ্রেণির অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও কর্মতৎপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কতকগুলো ‘শিশু মন্ত্রণালয়’ গঠন করে। সেসব মন্ত্রণালয়ের শিশুদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঁচ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে। যেমন-সকল শিশুর শিখন নিশ্চিতকরণ। বিদ্যালয় উন্নয়ন কার্যক্রমে আরো আছে:

- বিদ্যালয়ের আড়িনায় বাগান তৈরি ও পরিচর্যা।
- বিদ্যালয় ভবন ও আড়িনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন।



ছবি: বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে শিশুদের অংশগ্রহণের দৃশ্য

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের সম্পৃক্ত করতে হবে। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এসব কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, নিয়ম পালন, দলীয় বোধ, নেতৃত্বদান, দক্ষতা অর্জন, কায়িক শ্রমের প্রতি সম্মানবোধ তথা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও মূল্যবোধ বিকাশে বড় ভূমিকা রাখবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ে একাধিক ‘ক্লাব’ ও ‘হলদে পাখির দল’ গঠন করবেন (যদি না থাকে) এবং পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সম্ভবপর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট করবেন।

বিদ্যালয় এলাকার(ক্যাচমেন্ট এলাকা) উন্নয়নমূলক কাজ

আমাদের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট এলাকা আছে যাকে বিদ্যালয় এলাকা বা ক্যাচমেন্ট এরিয়া বলে। বিদ্যালয় এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ বসবাসের জন্য সবাইকে বিভিন্ন ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। এগুলোকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১) নিয়ম-কানুন মেনে চলার কাজ ও ২) সামাজিক অংশগ্রহণমূলক কাজ। পরিবার ও বিদ্যালয়ের মতো এলাকার নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনের সামাজিক ও নাগরিক গুণাবলি ও দক্ষতার বুনিনাদ রচিত হয়। এই উভয় ধরনের কাজে শিক্ষার্থীদের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং যতটুকু সম্ভব তাদের কাজ পরিবীক্ষণ করবেন।

ক) বিদ্যালয় এলাকার নিয়ম-কানুন পালন করা

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় এলাকার নিয়ম-কানুন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। যেমন-

- এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের যথাযথভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করা। সমবয়সীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে এবং ছোটদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতে শেখানো।
- পাড়া বা মহল্লার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মিলে যেসব নিয়ম-কানুন তৈরি করেছেন সেগুলোকে শ্রদ্ধা করতে ও মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।
- বিদ্যালয়ে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, বাজারে ও প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে বসে আড্ডা দেওয়া নিরুৎসাহিত করা। প্রচারমূলক কাজে এসব স্থানে মাইক, লাউড স্পিকার প্রভৃতি উচ্চ শব্দে ব্যবহার না করতে পরামর্শ দেওয়া। চলার পথে মেয়েদের উত্ত্যক্ত না করা।
- এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের অসুবিধা হয় এমন কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা। যেমন-রাস্তার ধারে বা যেখানে-সেখানে গৃহস্থালি কাজের বর্জ্য না ফেলা। নিজ বাড়ির গ্যাস বা পানির লাইন সংস্কার করার জন্য রাস্তা কাটার পর তা তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলা ইত্যাদি।
- প্রতিবেশী কারো বাড়ির ঠিকানা কোনো আগন্তুক জানতে চাইলে বা কোনো ধরনের সাহায্য চাইলে যথাসম্ভব তাকে সহযোগিতা করা। কারো সাথে অসদাচরণ না করতে পরামর্শ দেয়া।

খ) সামাজিক অংশগ্রহণমূলক কাজ

এলাকাভেদে উন্নয়নমূলক কাজের ধরন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এর সবগুলো এলাকাবাসীর সমবেত প্রচেষ্টাতে উন্নয়ন করা দুরূহ। তবে এলাকার এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো এলাকাবাসী মিলেমিশে সহজেই সম্পন্ন করতে পারেন। এটি আমাদের নাগরিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাই এ ধরনের কাজে এলাকার সদস্য হিসেবে মা-বাবা যেমন অংশগ্রহণ করবেন তেমনি পরিবারের সদস্য হিসাবে শিশুদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব পালন, সচেতনতাবোধ ও কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির জন্য মা-বাবা নিজেদের পাশাপাশি সন্তানদেরকেও এসব কাজে নিয়োজিত করবেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণেরও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে। তাঁরা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করবেন। নিজ এলাকার শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রয়োজনের সময় সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন। শিক্ষকবৃন্দ এলাকায় কী ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন তা এলাকার প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে। তবে সাধারণভাবে এলাকায় নিম্নোক্ত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে শিশুরা অংশগ্রহণ করতে পারে।

- পাড়া বা মহল্লার ভাঙা রাস্তাঘাট নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজে সহযোগিতা করা।
- পাড়া বা মহল্লার পুল, সাঁকো, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণে সাহায্য করা।
- ধর্মীয় স্থান, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করা।
- গাছ লাগানো, পরিচর্যা এবং সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।
- এলাকার পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। ময়লা-আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করা। সকলকে ডাস্টবিন অথবা নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলতে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেওয়া।
- নিরাপদ পানি পান সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা।
- এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- এলাকার সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি না করে সেগুলো ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- পাড়ায় বা মহল্লায় ছোটখাটো গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- এলাকার লোকজনকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা এবং বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা।



এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে শিশুদের অংশগ্রহণের ছবি

প্রাথমিক স্তরের ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বইয়ে এ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব পাঠ যথাযথভাবে শিখন-শেখানোর মধ্য দিয়ে শিক্ষক এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলবেন। পাশাপাশি নিজ এলাকায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজ আশু প্রয়োজন সে সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারণা প্রদান করবেন। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের পুঁথিগত জ্ঞান বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় করতে শিখবে।

এলাকায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ

সাধারণভাবে জীবনযাপন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও গড়ে তোলা নানা প্রতিষ্ঠানকে সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এলাকার সম্পদ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন—

- ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পদ
- সামাজিক সম্পদ, ও
- রাষ্ট্রীয় সম্পদ।

ব্যক্তিগত সম্পদ : ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে বোঝায় কোনো বিষয় বা বস্তুর ওপর সমাজ ও আইন স্বীকৃত এমন এক চূড়ান্ত মালিকানা-অধিকার, যার বলে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ও ক্ষমতা অর্জন করে। যেমন—জমিজমা, ঘরবাড়ি, পুকুর, বাগান, গাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এসব সম্পদ একজন ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে অথবা নিজে কিনে বা নিজের চেষ্টায় অর্জন করে। অপরের কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা সৃষ্টি না করে সে এই সম্পদগুলো খুশিমতো ব্যবহার করতে পারে।

সামাজিক সম্পদ : সামাজিক সম্পদে সমাজের সকল সদস্যের সমান অধিকার থাকে। সমাজের সবাই তা ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণও করে। সামাজিক সম্পদ সমাজে বসবাসকারী সবার সম্পদ। নদী-নালা, খাল-বিল, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, পার্ক, পাঠাগার ইত্যাদি সামাজিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ : ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদের বাইরে একটি দেশের যাবতীয় সম্পদই রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সেদিক থেকে বিভিন্ন সামাজিক সম্পদও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের এই সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—রাস্তাঘাট, সেতু, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন—নদনদী, খালবিল, সমুদ্র, বনভূমি, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। রাষ্ট্র পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ। একইভাবে বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা—শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক প্রভৃতিও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্গত। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদের মধ্যে রয়েছে যোগাযোগব্যবস্থা তথা রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার, ব্রিজ, কালভার্ট, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিমান, বিমানবন্দর, বাস, রেলগাড়ি, রেলপথ, জলপথ, স্টিমার, ফেরি ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম যেমন—রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি আমাদের মূল্যবান রাষ্ট্রীয় সম্পদ। রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে এ সকল সম্পদ ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের করণীয়

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পাঠ্যবইয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেশের জনগণের সম্পদ। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এসব সম্পদ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া এবং সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। নিচের কাজগুলো করার মধ্য দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করতে পারে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে যে কোনো সম্পদের ক্ষতি বা অপচয় রোধ করা। প্রয়োজন শেষে বাতি, পাখা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রান্নার পর গ্যাসের চুলা, পানির কল ইত্যাদি বন্ধ রাখা।
- এলাকার খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি রক্ষা করতে শিক্ষক নিজে সচেতনভাবে ব্যবহার করবেন ও শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন। যেমন-খোলা জায়গা বা পার্কের যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থান বা ডাস্টবিনে ফেলায় অভ্যস্ত করা।
- বিদ্যালয় ও এলাকার পাঠাগারের বই যত্নসহকারে পড়া এবং পাঠাগারের উন্নয়নের জন্য সাধ্যমতো অবদান রাখা।
- খালবিল, নদনদীর পানিতে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে পানি দূষণমুক্ত রাখা। অন্যরা যাতে পানি দূষিত না করে সে ব্যাপারে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করা।
- রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, তথ্য ও বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতি হয় এমন যে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা।
- যোগাযোগব্যবস্থা সচল রাখতে ও যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণে সচেতন হওয়া। যেমন-যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে বিরত থাকা ও ক্ষতিসাধন না করা, কোনো প্রয়োজনে রাস্তাঘাট কাটতে হলে তা কাজের পর পরই ঠিক করে ফেলা ইত্যাদি।
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণসচেতনতামূলক প্রচারণা ও কাজে অংশগ্রহণ করা।

অধ্যায় ৩

পরিবেশ

পরিবেশের ধারণা

পরিবেশ বলতে আমরা আমাদের বা যে কোন প্রাণির চারপাশে ঘিরে থাকা সকল কিছু বা সকল অবস্থাকেই বুঝি। সেটা জীবন্ত বা প্রাণহীন যাইহোক না কেন। যেমন- মানুষ ও তার ঘরবাড়ি, গাছপালা, রাস্তা, দোকান, বিদ্যালয়, খেলারমাঠ, মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা-গির্জা প্রভৃতি। আরো রয়েছে খাল-বিল-পুকুর, ডোবা, নদী-নালা-সাগর, পশু-পাখি, ফুল-ফল ইত্যাদি। এছাড়া আমাদের জীবনযাত্রা ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, প্রথা ইত্যাদি। আমাদের চারপাশ ঘিরে থাকা এই সবকিছু, যা আমাদের বৃদ্ধি, বিকাশ ও টিকে থাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে পরিবেশ বলে। মানুষ নিজেও পরিবেশের অংশ।

পরিবেশের প্রকারভেদ

পরিবেশকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ২) সামাজিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ : পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ও বিরাজমান সকল কিছু নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী তথা মানুষ, পশু, পাখি, গাছ ইত্যাদি যার প্রাণ আছে এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাণী নয় তবে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট আলো, বাতাস, মাটি, পানি, ভূমি, শিলা, নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, ঝড়-বৃষ্টি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি আরো অনেক কিছই প্রাকৃতিক পরিবেশভুক্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশকে অনেকে ভৌগোলিক পরিবেশও বলে থাকেন। নদীতে বাঁধ দিয়ে, বনের গাছ কেটে কিংবা নতুন বন সৃজন করে মানুষ নিজের প্রয়োজনে অনেক সময়েই প্রাকৃতিক পরিবেশকে বদল করে থাকে।

সামাজিক পরিবেশ: প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি মানুষ তার বিভিন্ন প্রয়োজনে সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলেছে এবং তার বিকাশ সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বাড়ি-ঘর, পরিবার, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, মানুষের আচার আচরণ, মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক, আদর্শ, রীতি-নীতি, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সরকার, শাসনব্যবস্থা, হাট-বাজার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সবকিছু মিলে সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ মানুষের তৈরি সবকিছুকে ধারণ করে।

পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক

পরিবেশের সাথে আছে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক। পরিবেশ মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। নিচে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। বলুনতো কোন কোন পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করছে? এবং কী কী ভাবে প্রভাবিত করছে?

তোতা ও টিয়া দুই ভাইবোন সকালে স্কুলে যাবে এমন সময় জোরে বৃষ্টি নামে। তাই ওরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু ওদের যে স্কুলে যেতে দেবী হয়ে যাচ্ছে। মা একটা ছাতি এনে দেয়। দুই ভাইবোন বেরিয়ে পড়লো। তোতা একটু বড় তাই ওর হাতে ছাতিটি। পিচ্ছিল আর কাদার পথে ছোট বোন টিয়া ঠিকমতো হাটতে পারছিলনা, একটু এগুতেই সে পিছলে পড়ে। জামাকাপড় কাদায় ভরে যায়। ওর আর সেদিন স্কুলে যাওয়াই হলো না। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরলো। ততোক্ষণে বৃষ্টি থেমে রোদ উঠেছে। মা তাড়াতাড়ি জামাটা ধুয়ে রোদে দিলেন। বৃষ্টির পর বাতাসটা ঠাণ্ডা তাই টিয়া একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে বসে। আজ আর ফ্যান চালাতে হয়নি।

বৃষ্টিহীন গ্রীষ্ম। প্রখররোদ, মাঠ-ঘাট চৌ চির কৃষকের পক্ষে মাঠে কাজ করা দুষ্কর। একটা পাতলা হাতাকাটা সাঁট ছাড়া কিছু গায়ে রাখা দায়। সেচ দেবার যন্ত্রের একটানা ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে গাছের ছায়ায় ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। স্কুল গুলোতে গরমের ছুটি।

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। গাছে গাছে পলাশ-শিমুল ফুল ভরে আছে। ছোটবড় ছেলে-মেয়ে সবাই ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যাচ্ছে, কণ্ঠে তাদের “আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো” গান। টেলিভিশন নানা রকম অনুষ্ঠান প্রচার করছে। আজ সরকারি ছুটি। মাইকে জোরে গান বাজছে।

রোদ, বৃষ্টি, বাতাস অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের জীবনকে প্রতি মুহূর্তে কীভাবে প্রভাবিত করে তার একটা নমুনা এই উদাহরণগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিবেশই যে শুধু মানুষের জীবনকেই প্রভাবিত করে তা নয় মানুষও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে বিশেষত প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশের পরিবর্তন করে। যেমন: প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট কোন মাঠকে লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষযোগ্য করা হয় বা মাটি খুঁড়ে রাস্তা বা বাড়ি-ঘর তৈরি করা হয়। নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ও নদী শাসন করা হয়। এ ধরনের পরিবর্তন অনেক সময় সমাজ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে থাকে, দূষিত করে পরিবেশ। যেমন: মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি করা, গাছপালা কেটে জ্বালানি তৈরি করা হয়। এই পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে পৃথিবীর এক এক জায়গায় এক এক ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, জীবনধারা বিভিন্ন রকম হয়। যেমন নদীর পাড়ের মানুষ সহজে চাষাবাদ করতে পারে তাই তাদের জীবন হয় সহজ, মানুষ হয় অল্প পরিশ্রমি। অন্যদিকে পাহাড়-মরুভূমি বা বরফ আচ্ছাদিত এলাকার মানুষদের অনেক পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়।

পরিবেশ দূষণ

আমাদের নিজের প্রয়োজনে (প্রাকৃতিক) পরিবেশকে ব্যবহার করতে গিয়ে পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত করে থাকি যাকে আমরা দূষণ বলি। মানুষ তাদের অপরিকল্পিত বা অপরিণামদর্শী কাজের মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায়, ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। যেমন কারখানার বর্জ্য বা ক্ষতিকর পদার্থ পানি ও মাটিতে ফেলার ফলে এগুলো দূষিত হয়। অর্থাৎ পরিবেশের যে কোনো অমঙ্গলজনক পরিবর্তন পরিবেশ দূষণ হিসেবে পরিচিত। পরিবেশ দূষণের কয়েকটি অন্যতম দিকগুলো হলো-পানিদূষণ, ভূমিদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, তেজস্ক্রিয়তাজনিত দূষণ ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশগত

সমস্যা, যেমন-ঘনবসতি, বস্তি সমস্যা, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, কৃষিভূমি সংকোচন, যানজট, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়, স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট ইত্যাদি।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল সমাজে ক্রমে যন্ত্রচালিত গাড়ি বাড়ছে সাথে বাড়ছে ধোঁয়া। এছাড়াও কলকারখানার ধোঁয়াও বায়ু দূষণ ঘটছে। এছাড়া যানবাহন ও কলকারখানার শব্দ, শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে। কলকারখানার বর্জ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান থাকে। এগুলো মাটি ও ভূ-গর্ভের পানির সাথে মিশে ভূমি ও পানিকে দূষিত করে। এছাড়া পরিবেশ দূষণের আরো অজস্র কারণ আছে।

পরিবেশ দূষণের সামাজিক কারণ

পরিবেশ বিভিন্ন ভাবে দূষিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করছে। সমাজের নিয়ম-নীতি মেনে না চলার কারণেও সামাজিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাওয়া, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান গুলোতে পর্যটকদের জন্য গড়ে ওঠা হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, যেখানে সেখানে এমনকি আবাসিক এলাকায় অপরিষ্কৃত ভাবে গড়ে ওঠা হাসপাতাল, ক্ষুদ্রকারখানা ও অফিসসমূহ আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছে। আমাদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষার উপযুক্ত শিক্ষার ও সচেতনতার অভাব বা ঘাটতি রয়েছে। আমরা পরিবেশ রক্ষায় গৃহীত আইন-কানুন না মেনে নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী কাজ করি, তাই ক্রমে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। নিচে কয়েকটি পরিবেশ দূষণের সামাজিক কারণ উপস্থাপিত হলো।

- দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ আমাদের পানি-ভূমি-বায়ু এমন কি শব্দ জগতকেও প্রভাবিত করছে। যখন জনসংখ্যা সীমিত ছিল তখন একটা পুকুরে হয়তো পাঁচ-ছয় জন গোসল করতো। এখন সেখানে কুড়ি জন গোসল করে এবং কাপড়ও ধোয়, গরু-ছাগল গোসল করায়, হাঁড়ি-পাতিল ধোয় আরো কতোভাবে ব্যবহার করে। তাহলে চিন্তা করুনতো সেই পুকুরের পানি কতোভাবে দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আমরা আজকাল অধিকাংশ মানুষ টিউবওয়েল ও ট্যাপকল ব্যবহার করি। মনে করুন আপনাদের বাড়িতে পাঁচজন আছেন, আরো পাঁচজন পাঁচ দিনের জন্য বেড়াতে এলো। সে কয়দিনে আপনাদের পানির উপর স্বাভাবিক ভাবেই চাপ বাড়বে। একইভাবে যদি আরো দশটি বাড়িতে কয়েকজন করে মানুষ যোগ হয়, তখন পুরো এলাকাতেই পানির স্বল্পতা দেখা দিতে পারে।



চিত্র: পানি দূষণ

- খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা জমিতে কীটনাশক ও কৃত্রিম সার ব্যবহার করি। একবারের পরিবর্তে বছরে তিনপ্রস্থ শস্য উৎপন্ন করি। এতে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস পেতে থাকে, মাটির বিভিন্ন উপাদান এর ভারসাম্যও নষ্ট হয়। বাসস্থানের চাহিদা মেটানোর জন্যও আমরা মাটিকে শুধু ব্যবহারই করছি না এই মাটিকে পুড়িয়েও ফেলছি। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গাছ কেটে, বন উজাড় করে, খাল-বিল, নদী ভরাট করে ও পাহাড় কেটে বসতি গড়ে তুলি। এভাবে নষ্ট করি পশুপাখির আশ্রয়স্থল; বন্ধ করে দেই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য হারায়।
- দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিদিন প্রতি বাড়ি থেকে ময়লা-আবর্জনা ফেলার পরিমাণও গেছে বেড়ে। যেমন- আপনাদের হোস্টেলে যখন ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী থাকে তখন যে পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ময়লা ফেলা হয় যখন ১০০ জন শিক্ষার্থী থাকে। এছাড়া প্রতিনিয়ত পানি ও বিভিন্ন রকম কোমল পানীয়, তেল ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক বোতল, বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিক ব্যাগ আমাদের আবর্জনার সাথে যুক্ত হচ্ছে। আমরা অনেক সময় এসকল ময়লা যেখানে-সেখানে ফেলি। কলকারখানার বর্জ্য নদী, খাল ও খোলা জায়গা ও আবাসিক এলাকায় ফেলি। যেখানে সেখানে কফ-থুতু ফেলি, মলমূত্র ত্যাগ করি যার ফলে নিজেদের চারপাশের পরিবেশ আমরা প্রতিনিয়ত নিজেরাই নোংরা করছি। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতির সাথে সাথে এর দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্য আমাদের পরিবেশ যথা- বায়ু, মাটি ও পানি মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।
- আমরা প্রতিনিয়ত গাড়ি, ইন্টের ভাটা ও কলকারখানা থেকে কালো ধোঁয়া নিঃসরণ করে বাতাসকে করে তুলছি দূষিত। অধিকাংশ নৌকা ইঞ্জিন চালিত। তাই আজকাল শান্ত নদীটি থেকে মাঝির কণ্ঠের সুন্দর গানের বদলে ইঞ্জিনের বিকট শব্দের সাথে প্রচুর কালো ধোঁয়া নিঃসৃত হতে থাকে। বাজি ফুটিয়ে বায়ুকে দূষিত করে।
- আজকাল যে কোন দোকানে বা অনুষ্ঠানে আমরা উচ্চ শব্দে মাইক বাজাই, বাজি ফোটাই অন্যের অসুবিধা একটুও চিন্তা করি না। যেখানে-সেখানে গাড়ির হর্ন বাজাই। বাড়িতে টেলিভিশন ও অন্যান্য গানের যন্ত্র উচ্চ শব্দে বাজাই।



চিত্র: শব্দ দূষণ

এভাবে বিভিন্ন উপায়ে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ ও এর বিভিন্ন উপাদানের ক্ষতি করে থাকি। প্রাথমিকভাবে পরিবেশ দূষণ ছিল একটি স্থানীয় সমস্যা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। গত কয়েক দশকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, শিল্পায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিবর্তিত ও অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের প্রভাব

পরিবেশ দূষণের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিচে এর প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

১. **পানিদূষণের প্রভাব:** পানিদূষণ মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। দূষিত পানি পান করলে পেটের পীড়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, জন্ডিস ইত্যাদি রোগ হয়। আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহার করলে চর্মরোগ হয়। বিশুদ্ধ পানি ছাড়া অন্যান্য জীবও ভালোভাবে বাঁচতে পারে না। এর ফলে আমাদের পানি ফুটিয়ে খেতে হচ্ছে, যার ফলে প্রচুর জ্বালানি খরচ হচ্ছে। ইদানিং প্লাস্টিক বোতলে খাবার পানি কিনতে পওয়া গেলেও প্লাস্টিক বোতলের জঞ্জাল নতুন সমস্যা বাড়াচ্ছে।
২. **ভূমিদূষণের প্রভাব:** দূষিত মাটিতে উৎপাদিত ফসল ও শাকসবজি খেলে মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আমাদের গ্রামগুলোতে ছোট-বড় সব মানুষই সারাক্ষণ বসা-শোয়া-খেলা-চাষাবাদ করার জন্য সরাসরি মাটির সংস্রবে থাকে, তাই মাটি দূষিত হলে তাদেরও বিভিন্নরোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
৩. **বায়ুদূষণের প্রভাব:** সমাজে আজকাল চলাফেরার সময় অনেক মানুষকেই দেখা যায় নাকে মাস্ক পরা বা কাপড় বাঁধা, সমাজের এ চিত্রের জন্য দায়ী দূষিত বায়ু। বায়ুদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, যেমন অনেকে শ্বাসকষ্ট, সর্দি, কাশি, চর্ম ক্যান্সার এবং হৃৎপিণ্ডের রোগে ভোগে ও মৃত্যুহার বাড়িয়ে দেয়। বায়ুদূষণের ফলে অনেক মানুষের চোখ জ্বালাপোড়া করে, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। দূষিত বায়ু আমাদের ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আমাদের মধ্যে ক্লান্তিবোধ নিয়ে আসে এবং আমাদের যথাযথভাবে চিন্তা করার সামর্থ্য কমিয়ে দেয়। দূষিতবায়ুয়ে স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানকার ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, কাপড়, খাবার সবকিছুকেই দূষিত করে। তাই এসব জিনিষ অল্প কিছু দিনেই জৌলুস হারিয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

৪. **শব্দদূষণের প্রভাব:** শব্দদূষণ মানুষ ও প্রাণীর ওপর নানা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সমাজে যারা শব্দদূষণের সৃষ্টি করে তাদের সাথে প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায়ই তিক্ততা, মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এতে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। শব্দদূষণের কারণে কানে ব্যথা এমনকি শরীরেও ব্যথা হতে পারে। এছাড়া মানুষের শরীরে নানা উপসর্গ দেখা যায়। যেমন: বিরক্তি ভাব, ঘনঘন মাইগ্রেন জাতীয় মাথাব্যথায় আক্রান্ত হওয়া, অবসাদ, আলসারের প্রকোপ বেড়ে যাওয়া, অ্যালার্জি, অনিদ্রা, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা, অকারণে মেজাজ খিটখিটে হওয়া, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া ও এর থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এসব কারণে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
৫. **তেজস্ক্রিয়তাজনিত দূষণের প্রভাব:** তেজস্ক্রিয়তাজনিত দূষণ মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য মারাত্মক এক হুমকি। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে মানবদেহে চর্মরোগ, প্রাণঘাতী বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিসহ ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। সাগরে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিঃসরণের ফলে মাছসহ অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে ও তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মাটি, পানি ও বায়ু দূষণে জমিতে উৎপাদিত ফসলের তেজস্ক্রিয়তা বাড়ে। এ ধরনের তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি উদ্ভিদকূলের ক্ষতিসহ মানবদেহে নানারকম রোগসহ ক্যান্সারের কারণ হয়ে দেখা দেয়। এক্সরে ও ওয়েলডিং থেকে ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয়তা বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর সংস্পর্শে মানবদেহের নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।
৬. **সামাজিক পরিবেশ দূষণের প্রভাব:** এটি মানুষের উন্নত ও গুণগত মানসম্মত জীবনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এর ফলে দেখা দেয় সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা, বাধাগ্রস্ত হয় সুস্থ সামাজিক ও মানসিক বিকাশ।

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয়

পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন-

- ক) যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা
- খ) পানি দূষিত হয় এমন কাজ না করা
- গ) শব্দদূষণ না করা
- ঘ) গাছ নিধন না করা
- ঙ) ভূমিদূষণ না করা
- চ) বায়ুদূষণ না করা ইত্যাদি

দূষণ রোধে শিক্ষকের করণীয়:

সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষক তার নিজ এলাকায় একজন আদর্শ ব্যক্তি। সমাজের অনেক করণীয় কাজের সাথে শিক্ষক নিজেকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেন। আমাদের পরিবেশ দূষণ রোধ ও সংরক্ষণেও তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষক নিজ বাড়ি ও তার আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখবেন, যাতে তার এলাকাটি দূষণমুক্ত থাকে। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে পারেন। যেমন- উচ্চ শব্দে মাইক না বাজানো, খাবারের খালি প্যাকেটসহ অন্যান্য আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলা ইত্যাদি। পাড়া-প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় এলাকায় পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারেন। এলাকায় কোন জলাশয় বা পুকুর দূষণ মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিবেশ দূষণ বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যার কবল থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। এ দায়িত্ব শিশুসহ আমাদের সবার, সকল নাগরিকের। শিশুদের মাঝে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ

রক্ষামূলক কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব মনোভাব গঠন ও দক্ষতা অর্জন পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। আর পারিবারিকভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের পরিবেশ রক্ষার যে অভ্যাস গড়ে উঠবে, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হলো তাকে আরো বিকশিত ও স্থায়ী করা। এখন পরিবেশ দূষণরোধে শিক্ষকদের করণীয় কী কী তা বর্ণনা করা হলো।

১. আমরা শিক্ষার্থীদেরকে পারিবারিকভাবে পরিবেশ ভালো রাখতে শিক্ষা দেব এবং অভ্যাস গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করবো। পরিবারে মা-বাবা ছোট শিশুকে তার স্বাস্থ্য সচেতনতার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন। ছেলেমেয়েদের সময়মতো দাঁত মাজা, নখ কাটা, নোংরা স্থানে এবং নোংড়া জিনিস দিয়ে না খেলা, খেলার পর ভালো করে হাত-মুখ ধোয়া, খাবার আগে হাত-মুখ ধোয়া ইত্যাদি কাজে দৃষ্টি রাখবেন ও অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। চকোলেট, চুইংগাম, বিস্কুট, ফাস্টফুড ইত্যাদির মোড়ক, কলার খোসা, বাদামের খোসা প্রভৃতি মা-বাবা শিশুদের দিয়ে বাড়ির ময়লা রাখার পাত্রে ফেলতে অভ্যস্ত করবেন। তারা যেন খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ না করে টয়লেট বা পায়খানা ব্যবহার করে সে ব্যাপারে অভ্যাস গড়ে তুলবেন।
২. বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে কোনো পরিবেশেই আমরা যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকবো। নোংরা আবর্জনা পানিতে বা রাস্তায় বা খেলার মাঠে ফেলব না। পুকুর, খাল ও নদীর পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেলব না। রাস্তাঘাটে চলার সময় যেখানে-সেখানে কফ, থুথু বা নোংরা জিনিস ফেলব না। রাস্তায় বা খেলার মাঠে কোনো নোংরা জিনিস বা ময়লা পড়ে থাকলে তা আমরা নিজেরাই কারো স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না এমন নিরাপদ স্থানে ফেলে আসব।
৩. শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয় গৃহ, শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষা দেব। বিদ্যালয় চলাকালে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসার আগের সময়টাতে শিক্ষার্থীদের অযথা হৈচৈ না করার অভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকবৃন্দকে নিতে হবে।
৪. বাড়িতে উচ্চ শব্দে রেডিও বাজিয়ে, টেলিভিশন দেখে, বিদ্যালয়ে বা আশপাশে জোরে মাইক বাজিয়ে শিক্ষক কখনই শব্দদূষণ করবেন না।
৫. বাড়িতে, এলাকায় ও বিদ্যালয়ের চারপাশে শিক্ষক বেশি করে গাছ লাগাবেন, সেগুলোর যত্ন নেবেন। বৃক্ষরোপণ অভিযানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন। রোপণ করা চারাগাছের যথাযথ পরিচর্যা ও সংরক্ষণেও তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন।
৬. এলাকার রাস্তাঘাট, হাটবাজার, বিদ্যালয়, মজুব, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, হাসপাতাল, ব্রিজ, সাঁকো, পাহাড়, জলাভূমি প্রভৃতি আমাদের সামাজিক ও জাতীয় সম্পদ। শিক্ষার্থীদের কাজের মাধ্যমে এগুলোর স্বাভাবিক পরিবেশ যাতে ব্যাহত না হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে তাদের সচেতন করবেন। স্থানীয়, প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক উদ্যোগে এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন।
৭. প্রতি বছর ৫ জুন ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’; আমরা পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিমূলক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ দিনটি পালন করব। আমাদের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা, র্যালি, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, ছবি অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করব। স্থানীয় পরিবেশ বিষয়ক উদ্যোগসমূহ ও দলসমূহকে সমর্থন করব। উল্লেখ্য, শিশুদের মাধ্যমে পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন সকলকে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত বার্তা সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায়।

৮. জাতীয় পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ রক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন আইন-কানুন মেনে চলতে হবে।
৯. লিফলেট, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম, রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদমাধ্যমে এবং অনলাইনে যেমন-ফেসবুকে (facebook) দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রচারণার মাধ্যমে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষক ও শিশুর করণীয়

গ্রাম ও শহরাঞ্চলের শিশুরা পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব কাজ করার মধ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়। অতএব শিক্ষক শিশুদের নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে অনুপ্রাণিত করবেন।

গ্রামের শিশুরা নিচের কাজগুলো করার জন্য তাদের মা-বাবাকে অনুরোধ জানাতে পারে। এছাড়া নিজেরাও সম্ভবমতো অংশগ্রহণ করতে পারে।

১. ধোঁয়াহীন চুলার ব্যবহার বা বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন।
২. রান্নাঘরের ধোঁয়া সহজে বের করার ও বায়ুপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. গৃহপালিত পশু বাড়ির বাইরে রাখা।
৪. বাড়ির চারপাশে, পতিত জমিতে এবং রাস্তার ধারে পরিবেশবান্ধব গাছ লাগানো এবং সেগুলোর যত্ন নেয়া।
৫. ঢালু জমি যেখানে বেশি করে পানি গড়িয়ে পড়ে মাটি ধুয়ে নিয়ে যায় সেখানে মাটির বাঁধ দেয়া।
৬. খাল, বিল, পুকুর নদী ও পানির অন্যান্য উৎস পরিষ্কার রাখা।
৭. বাড়ি ও কূপের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
৮. উচ্ছিষ্ট বিভিন্ন জিনিস, গোবর বা অপচয়মূলক জিনিসকে জৈব সার তৈরির কাজে ব্যবহার করা।
৯. বাড়ি ও পানির উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে ও সুবিধাজনক স্থানে পায়খানা নির্মাণ করা।
১০. কৃষিভিত্তিক রাসায়নিক সার সতর্কতার সাথে পরিমিতভাবে ব্যবহার করা।
১১. ব্যাগ, সাপ, বেজি, পাখি ইত্যাদি বন্য পশুপাখি রক্ষা করা।

শহর বা নগরের পরিবেশ দূষণ হ্রাসে শিশুরা যা যা করতে পারে-

১. বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আঙিনায় গাছ লাগানো। ফ্ল্যাটবাড়িতে বাস করলে মাটির পাত্রে বা কাঠের বাস্কে গুল্ম ও লতাপাতা জাতীয় উদ্ভিদ ব্যালকনিতে পরিচর্যা করা।
২. রাস্তার পাশে লাগানো চারাগাছ সুরক্ষা করা।
৩. জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা; যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে আঁস্তাকুড়ে ফেলা। রাস্তার ওপর ময়লা-আবর্জনার স্তুপ না রাখা।
৪. রাস্তার ধারে, বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে, খেলার মাঠের চারদিকে এবং পার্কে ছায়ার জন্য গাছ লাগানো।
৫. প্লাস্টিক সামগ্রী ও পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার ও তা যেখানে-সেখানে ফেলা থেকে বিরত থাকা।
৬. জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে হৈচৈ না করে নীরবতা বজায় রাখা।
৭. পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন ব্যতিরেকে মোটরযান ব্যবহার পরিহারের অনুরোধ জানানো। হাঁটার অভ্যাস করা এবং বাইসাইকেল ব্যবহার করা।

৮. অন্য কেউ শিশুদের নিজ এলাকায় পরিবেশ দূষণ করলে মা-বাবা বা শিক্ষকের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
৯. পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য গ্রহীত উদ্যোগসমূহে অংশগ্রহণ, অন্যদের আমন্ত্রণ জানানো ও এ লক্ষ্যে তৈরি বিভিন্ন আইন মেনে চলা।

অধ্যায় ৪

মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মানবতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন ও চর্চার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য যা কিছু করণীয়, যা কিছু গ্রহণীয়, যা কিছু বরণীয়-তাই মানবিক গুণাবলি। ‘নৈতিকতা’ হচ্ছে একটি সামাজিক গুণ যা ব্যক্তি বা দলের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত করে। সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও নৈতিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারা দ্বারা সৃষ্ট একগুচ্ছ উদ্দেশ্য বা নিয়ম যা ব্যক্তি বা দলকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনুসরণ করতে হয় এবং অভ্যাসে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তার পরিচর্যা চলতে থাকে। এর মাধ্যমে তাদের যৌক্তিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে এবং তার আলোকে সমাজের নানা ক্ষেত্রে কাজ ও আচরণ করতে শেখে। তাদের সামাজিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের সামাজিক গুণাবলি অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ইউনিটে শিশু শিক্ষার্থীদের কতকগুলো মূল্যবোধ অর্জন ও চর্চায় পরিবার ও বিদ্যালয় কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারে তা সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মানবতা

মানবতা হচ্ছে মানুষের প্রত্যাশিত সহজাত গুণ বা উৎকর্ষ, যা মানুষকে মানুষ হিসেবে পরিচিত করে। এটি মানুষের এমন একটি গুণ যা মানুষকে অন্যান্য প্রজাতি থেকে আলাদা করে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। এটি মনুষ্যত্বের নামান্তর। অর্থাৎ, মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে মানবতার মাধ্যমে। মানবতাকে আরও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়। যেমন-মানবতা হচ্ছে সহৃদয় বা পরদুঃখকাতর হওয়ার গুণ বা উৎকর্ষ তথা দয়ালু অনুভূতি; অন্যের হিত সাধনের সংকল্প বা ইচ্ছা, বিশেষ করে বিপন্ন মানুষ বা প্রাণীকে উদ্ধার বা সহায়তা করার স্বভাব এবং সকল সৃষ্টির সাথে দয়া ও স্নেহপরায়ণ আচরণ করা ইত্যাদি। নিরন্নকে অন্ন দেওয়া, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় প্রদান, অনাথ-এতিমদের সাহায্য করা, ঋণীর ঋণের বোঝা লাঘবে সহায়তা করা, আর্ত-পীড়িতের জন্য সহানুভূতিশীল মনোভাব, তাদের সেবা করা, সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, সহনশীল হওয়া ইত্যাদি সবই মানবতার বহিঃপ্রকাশ।

মানুষ হিসাবে ব্যক্তির স্বকীয়তা প্রকাশ পায় তার মানবতা তথা মানবিক গুণাবলির মধ্য দিয়ে। মানবতার একটি বড় দিক হলো দুনিয়ার সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা, শ্রদ্ধা করতে শেখা। মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখার অর্থ হলো আমরা পরিবার, বিদ্যালয়, এলাকা, সমাজ অথবা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসবাস করি না কেন, আমাদের চেনা-জানা বা আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধাবোধ অটুট রাখা ও সমআচরণ করা। যেমন-পরিবারের সদস্যরা প্রধানত নারী ও পুরুষে বিভক্ত। মানবতার বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো

ভেদাভেদ না করা। সবার অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা সমানভাবে দেখা। আবার, বিদ্যালয়ের কথা ধরা যাক। সেখানে বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও বর্ণের ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে। শিক্ষকসহ আরো অনেকে সেখানে কাজ করেন। মানবতার নিরিখে তাদের বড় পরিচয় হলো তারা সবাই মানুষ। এখানে বয়স, মেধা, পেশা বা অর্থবিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে কাউকে বড় অথবা কাউকে ছোট করে দেখা মানবতা সমর্থন করে না। একইভাবে সমাজেও নানা বয়স, পেশা, ধর্ম, গোত্র ও বর্ণের মানুষ রয়েছে। তাদের আলাদা আলাদা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও প্রথা রয়েছে। সমাজের সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা, তাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং তার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা, সাহায্য সহযোগিতা করা ইত্যাদি হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধের বিকাশে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা

শিশুর মানবতাবোধ বিকাশের প্রথম ক্ষেত্র তার পরিবার। মা-বাবা, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই-বোন বা অন্য সদস্যরা এখানে শিশুর মানবতাবোধ বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। একইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানবিকবোধ বিকাশে বিশেষভাবে যত্নবান হবেন। এ ক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলো তাদের জন্য সহায়ক হবে—

- মা-বাবা বা অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য শিশুদের পরিবারের বড়দেরকে যথাযথ সম্মান ও ছোটদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে শেখাবেন।
- পরিবারে নারী বা পুরুষ সকল সদস্যের প্রতি সমান সম্মান ও সৌজন্য নিজেরা প্রদর্শন করবেন এবং শিশুদেরও তা করতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। বাড়িতে ছেলে ও মেয়েকে কোনো কাজ করতে দিলে তা এমনভাবে দিতে হবে যেন তা কাউকে কম বা বেশি না করতে হয়। কাজ করতে গিয়ে কারো মনে এই বোধ যেন না জন্মে যে, সে ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কারণেই তাকে বেশি কাজ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি খেয়াল রাখা একান্ত জরুরি।
- ছেলে বা মেয়ে কেউ যেন অনুভব না করে যে, সে সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শিশুর খাবার, পোশাক, পরিচ্ছদ, লেখাপড়ার উপকরণ, স্নেহ-ভালোবাসা, অনুশাসন, বিনোদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে সমতামূলক আচরণের প্রতি মা-বাবাকে সজাগ ও যত্নবান হতে হবে।
- মা-বাবা কাজের অবসরে শিশুদের বিভিন্ন মনীষীর মানবতামূলক কাজের গল্প শোনাবেন। তাদেরকে মনীষীদের জীবনীগ্রন্থ পাঠে উৎসাহ যোগাবেন।

- বাড়ির কাজে সহায়তাকারী ছেলে বা মেয়ে অথবা মহিলার সাথে মা-বাবা নিজেরা মানবিক আচরণ করবেন এবং শিশুদেরকেও অনুরূপ আচরণ করতে অভ্যস্ত করবেন। কারো অসুখ-বিসুখ হলে তাকে সাধ্যমতো সেবা করতে শেখাবেন।
- মা-বাবা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন এবং দরিদ্র ও দুস্থদের সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করবেন এবং সন্তানদেরকে অনুরূপ কাজের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শেখাবেন।
- সকল পেশার মানুষ যে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ইতিবাচক বোধ জাগ্রত করার জন্য মা-বাবা তাদের কাছে এসব পেশার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক তার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী, অভিভাবক, কর্মচারীদের প্রতি সৌজন্যমূলক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সেমতো সৌজন্যমূলক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- শুধু মানুষের সাথে নয়, অন্যান্য সকল সৃষ্টির প্রতি মানবিক আচরণ করার তাৎপর্য তাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। তারা এ ধরনের আচরণ করছে কি না তা-ও পর্যবেক্ষণ করবেন।
- যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা দুঃসময়ে সবাই মিলে দুর্গত ও দুস্থদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের দ্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে মা-বাবা বা শিক্ষক সময়ে সময়ে অনাথ আশ্রম, এতিমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস যেমন ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস, ১২ জুন বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস ইত্যাদি বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হবে/উদযাপন করবেন এবং শিশুরা/শিশুদের তাতে অংশগ্রহণ করবে।
- পরিবার, এলাকা বা বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের চলাফেরা ও লেখাপড়ায় সঠিকভাবে সহযোগিতা করতে মা-বাবা ও শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তমভাবে অনুপ্রাণিত করবেন। শিশুরা যাতে তাদের এরূপ সহপাঠীদের বিদ্যালয়ে চলাফেরা ও লেখাপড়ায় সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত হয় সেভাবে বোঝাবেন।
- বিশ্বের অন্য যেকোনো প্রান্তে মানুষের কোনো ধরনের বিপদ-আপদে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমবেদনা ও সহমর্মিতাবোধ জাগিয়ে তুলতে মা-বাবা ও শিক্ষকবৃন্দ সচেতন ভূমিকা পালন করবেন।

নৈতিকতা

নীতি নাই যার অনেক কিছুই নাই তার। নীতিহীন মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। সঠিক নিয়মনীতি বিবর্জিত ব্যক্তির কার্যকলাপের জন্য সামাজিক জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। তাই আমাদের একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে হবে। সকল পেশায় নিয়োজিত প্রতিটি মানুষেরই সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনই নৈতিকতা। নৈতিকতা হলো সঠিক রীতি-নীতি, আইনকানুন ও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও নীতিবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সবাইকে কতকগুলো আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। মূল্যবোধ বিবেচনা করে যিনি কাজ করেন তিনিই নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত। উন্নত সমাজব্যবস্থার জন্য নৈতিকতা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ববোধ ও মমত্ববোধ থেকে সৃষ্ট এ গুণটি ছাড়া সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়।

ভালো-মন্দ বিচার করা, সৎ কাজে সহযোগিতা করা, মিথ্যা বা অসত্যকে ঘৃণা করা, সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণীজনকে সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা এসবই নৈতিক গুণাবলির উদাহরণ। আজ আমাদের সমাজে নানাবিধ নৈতিকতার অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিথ্যা বলা, ঘুষ নেয়া, কর ফাঁকি দেওয়া, ওজনে কম দেওয়া, পরনিন্দা করা, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা, মাদক সেবন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ইত্যাদি আমাদের সমাজে নৈতিকতা অবক্ষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এসব অনৈতিক কার্যকলাপ আমাদের পরিহার করে সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক গুণাবলি বিকাশে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা

পরিবারের নিয়ম-নীতি ও আদর্শ শিশুদের উপর প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কথা, কাজে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়। তিনি শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক এবং বন্ধু। শিক্ষকের নৈতিক গুণাবলি যা দৈনন্দিন আচার-আচরণে, কথায়, মন্তব্যে, রুচিতে, ভাষায় প্রকাশিত হয় সে সবই শিক্ষার্থীদের চরিত্র এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে বাঞ্ছিত এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারে সে কারণে তিনি বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি গ্রহণ করেন।

- শিক্ষকদের কথার সাথে কাজের সঙ্গতি থাকবে। তাঁরা নিজেদের সততা, আদর্শ ও কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।
- তিনি বিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং শিক্ষার্থীদের এ নিয়ম-নীতি পালনে অভ্যস্ত করতে সহায়তা করবেন।

- পরিবার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শ্রেণি পঠন-পাঠনের কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সময়মতো শুরু ও শেষ করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ যথাসময়ে শেষ করতে তাগিদ দেবেন।
- পরিবারে মা-বাবা সমাজের সৎ ও ন্যায়কাজে সমর্থন দেবেন ও তা প্রতিষ্ঠা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। শিশুদেরকেও এ ধরনের কাজ করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক লক্ষণ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। যেমন-নম্র স্বভাব, ভীত বা দুর্বল শিক্ষার্থীগণকে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস আনার চেষ্টা করবেন।
- শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষক যেমন সযত্ন দৃষ্টি রাখবেন, তেমনি পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির জন্য বিশেষ সহায়তা দেবেন।
- শিক্ষক সামাজিক কোনো সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও একইভাবে স্বকীয় চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করবেন।

নিয়মানুবর্তিতা

নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা বলতে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করাকে বোঝায়। এটি একটি কার্য অনুশীলন বিধি, যা ব্যক্তির মানসিক শক্তি বা নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। ব্যক্তির সুবিন্যস্ত আচরণের ধরন হিসেবেও এটিকে অভিহিত করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক আচরণ করতে ও নির্দেশনা মেনে চলতে শেখে। ফলে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য সম্পাদিত হয়। অনেক সময় শৃঙ্খলার বাস্তবায়ন বলতে শাস্তি প্রদানকে বোঝানো হয়। এটি শৃঙ্খলার নেতিবাচক দিক বহন করে। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা ও শাস্তি প্রদান এক কথা নয়। বরং শৃঙ্খলার সাথে শিক্ষণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা চরিত্র গড়ার পদ্ধতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গ্রহণযোগ্য আচরণের শিক্ষাকে নির্দেশ করে। নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা শিশুদের মন্দ থেকে ভালো, কোন আচরণগুলো গ্রহণযোগ্য অথবা গ্রহণযোগ্য নয়, কীভাবে অপরের অধিকারকে সম্মান করতে হয় ইত্যাদি শিখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুকে খাবার গ্রহণের আগে তার হাত ধোয়ার শিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে, খাবারের আগে হাত ধোয়া একটি নির্দিষ্ট আচরণের ধরন এবং সে এই ধরন আত্মীকরণের মাধ্যমে শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়। এ ধরনের শিক্ষা শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে ও সুশৃঙ্খল হতে সাহায্য করে।

নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর কতিপয় কৌশল

শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর একক কোনো সঠিক পস্থা নেই। তথাপি শিশুকে কীভাবে কার্যকরভাবে নিয়মানুবর্তিতা শেখানো যায় তা শিক্ষক এবং সব মা-বাবার জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। মা-বাবার অতিরিক্ত কর্তৃত্বপূর্ণ শাসন অথবা অনুশাসনের একেবারেই শৈথিল্য কোনোটিই শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণ সংগঠনের জন্য ইতিবাচক নয়। শিশুকে নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর জন্য মা-বাবা শিশুর ওপর অবশ্যই নিয়মনীতি আরোপ করবেন, তবে তা হবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত যাতে তাদের স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশ ঘটে। নিয়ম-নীতি চালু করার সময় তারা শিশুকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন কেন আমরা এসব মেনে চলব, কেন তা মেনে চলা আমাদের প্রয়োজন।

শিশুকে নিয়মানুবর্তিতা শিখনে নিচের কৌশলসমূহ ফলপ্রসূভাবে সহায়তা করতে পারে :

- পরিবারে মা-বাবা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন এবং তাদেরকে সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবেন।
- পরিবারের নিয়ম-কানুন যেমন-ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, নিয়মিত দাঁত মাজা, একসাথে বসে খাওয়া, কোথাও গেলে বলে যাওয়া, নিয়মিত প্রার্থনা করা ইত্যাদি ব্যয়োজ্যেষ্ঠরা যেমন মেনে চলবেন তেমনি শিশুদের তা মেনে চলার অভ্যাস গঠনে অধিক অনুশীলন করাবেন।
- বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে শিশু যখন কোনো কাজ নিয়ম ও শৃঙ্খলার সাথে করে তখন তাকে প্রশংসা করার মাধ্যমে তাদের ভাল আচরণ করার স্পৃহাকে জোরদার করবেন।
- শিক্ষকগণ নিয়মিত ও যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসবেন এবং সকল কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করবেন। এতে করে শিক্ষার্থীরাও নিয়মানুবর্তী হবে।
- শিক্ষকের প্রাত্যহিক সমাবেশে উপস্থিত থাকা, যথাসময়ে ক্লাসে যাওয়া, ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া, ঠিক সময়ে পাঠদান শেষ করা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীকে নিয়মানুবর্তী হতে উদ্বুদ্ধ করে।
- খেলার মাঠে দল গঠন, দলনেতা নির্বাচন ও ফল বিচারে শিক্ষক নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যনিষ্ঠ হবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও তা মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- মা-বাবা ও শিক্ষক তাদের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে নিজেকে শিশুদের কাছে একজন ভালো ও অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করবেন।

- শিশুকে অত্যধিক প্রশংসা করবেন না । আবার শিশুর নেতিবাচক দিককে কখনো বড় করে তুলবেন না ।
- পরিবারে মা-বাবা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিশুকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করবেন না । শিশুকে চড়-থাপ্পড় মারা বা অন্য কোনো শারীরিক শাস্তি প্রদান না করে তাকে ভালো-মন্দ বোঝাবেন ।

জীবনে উন্নতি ও সাফল্য অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি হলো নিয়মানুবর্তিতা । আমরা শিশু শিক্ষার্থীদের তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং নানা প্রয়াসের মাধ্যমে তাদের নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তুলব ।

শ্রমের মর্যাদা

শ্রমের মর্যাদা বলতে বোঝায় যে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সকল ধরনের কর্ম বা পেশাগত পদমর্যাদা বা অবস্থানকে সমানভাবে সম্মান করা ও গুরুত্ব দেয়া । শ্রমের মর্যাদার অর্থ হল কোনো কাজই উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বা নিরর্থক নয় । সকল কাজই ভালো কাজ এবং প্রত্যেক ধরনের কাজ মর্যাদাপূর্ণ । কোনো কাজকে উঁচু বা নিচু মনে করা পুরোপুরিভাবে ভুল ধারণা । অর্থাৎ কারো এমন ভাবা নিরর্থক যে, কোনো বিশেষ ধরনের কাজ তার মর্যাদা কমিয়ে দিচ্ছে বা নিচে নামিয়ে ফেলছে ।

সভ্যতার অতি সূচনাকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে আসছে । পৃথিবীর সকল ধর্মে মানুষকে সততার সাথে তার কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । দুনিয়ার সকল দার্শনিক প্রচার করেছেন যে, পৃথিবীর কোনো কাজ-ই মানুষের জন্য মর্যাদাহানিকর নয় । স্রষ্টা স্বয়ং মানুষকে কাজ করতে ও কঠোর পরিশ্রম করতে আদেশ দিয়েছেন । মহামানবেরা বলেছেন যে, কাজ হচ্ছে উপাসনার শামিল (work is worship) । পৃথিবীর সকল মনীষী কঠোর পরিশ্রম করেছেন । শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ আমাদের অনেকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । আমাদের সমাজে একটি অমূলক বিশ্বাস এখনো প্রচলিত যে, কায়িক বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ শিক্ষিত, ধনী এবং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্য নয় । এটি নিরক্ষর ও দরিদ্র মানুষের কাজ । এটি একটি মিথ্যা ধারণা । সমাজে সব কাজেরই সমান মর্যাদা আছে ।

আমরা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে অনেক সময় বিভিন্ন কাজের জন্য গৃহকর্মী বা অন্যদের উপর নির্ভর করি । অনেক সময় একজন শিক্ষিত যুবক অধিক উপার্জনক্ষম কায়িক শ্রমের কাজের চেয়ে স্বল্প বেতনের অফিস কেন্দ্রিক চাকরিকে অধিক প্রাধান্য দেয় । এর কারণ তারা মনে করে যে, নিজের হাতে কাজ করলে তাদের সম্মানহানি হবে এবং অন্যের চোখে তার অবস্থান নিচু হবে । এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ কর্তৃক এক কাজের সাথে আরেক কাজের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কাজ কাজ-ই এবং একে উঁচু বা নিচু হিসেবে শ্রেণিভেদ করা ঠিক নয় । একজন মেথরের কাজ একজন ডাক্তার, প্রকৌশলী বা শিক্ষকের কাজের মতোই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ।

কায়িক শ্রমমূলক কাজের প্রতি অশ্রদ্ধা আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে এক বড় প্রতিবন্ধক। এটি সমাজে একটি কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করেছে। ফলে আমরা কায়িক শ্রমবিমুখ হয়ে পড়েছি। দেশে বর্তমানে ব্যাপক পরিমাণে শিক্ষিত বেকার সমস্যার একটি অন্যতম বড় কারণ হলো কায়িক শ্রমের প্রতি তাদের এই মনোবৃত্তি। আবার, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির প্রতি তাকালেও আমরা দেখতে পাব যে, কায়িক শ্রমের প্রতি যারা এ ধরনের অপ্রবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তারা অনুন্নত ও দরিদ্র হয়ে গেছে। বিপরীতে, যেসব জাতি কায়িক শ্রমের কাজ নিজেরাই করতে ভালোবাসে তারা অভাবিত অগ্রগতি সাধন করেছে। আমাদের শিশুদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। আর সে দায়িত্ব আমাদের পরিবার ও বিদ্যালয়কে পালন করতে হবে।

শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ তৈরিতে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা

পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিচের কাজগুলো শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি যথাযথ সম্মান বা শ্রদ্ধাবোধ তৈরির জন্য সহায়ক হবে—

- মা-বাবা শিশুদের পড়ালেখা তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি তাদেরকে পরিবারের ছোটখাটো কাজ করার নির্দেশনা দেবেন। যেমন—পড়ার পর বইপত্র, খাতা, পেন্সিল, চেয়ার, টেবিল বা মাদুর গুছিয়ে রাখা। সময়মতো চেয়ার টেবিল পরিষ্কার করা। নিজেদের পোশাক, ব্যাগ, জুতা, খেলনা প্রভৃতি গুছিয়ে যথাস্থানে রাখা। তারা এসব কাজ ঠিকমতো করছে কি না তা মা-বাবা তত্ত্বাবধান করবেন।
- মা-বাবা শিশুদের যথাস্থানে বা ময়লা রাখার নির্দিষ্ট ঝুড়িতে ময়লা আবর্জনা, কাগজের টুকরা, কলার খোসা, খাবারের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলবেন।
- মা-বাবা ঘর ও উঠোন ঝাড় দেয়া, বিছানা ও আসবাবপত্র গোছানো, গোসলখানা ও শৌচাগার পরিষ্কার ইত্যাদি কাজে ছেলেমেয়েদের সম্পৃক্ত করবেন। এসব কাজ যে কোনোক্রমেই ছোট নয় তা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবেন।
- বড়দের কাজে যেমন- দাদা-দাদির যত্ন নেওয়া, অসুখ-বিসুখে সাধ্যমতো সেবা করা ইত্যাদি করতে মা-বাবা তাদেরকে নির্দেশনা দেবেন ও তত্ত্বাবধান করবেন। একইভাবে ছোটদের কাজে তারা সহযোগিতা করছে কি না তা লক্ষ্য রাখবেন।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করবেন যাতে তারা বিদ্যালয়ের আঙিনা, শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠ, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করে। সময়ে সময়ে তারা নিজেরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

- এলাকার বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য মা-বাবা ও শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবেন এবং সম্ভবমতো শিশুদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবেন।
- মা-বাবা ও শিক্ষকবৃন্দ তাদের সন্তান তথা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের ঝাড়ুদার, দণ্ডুরি, আয়া, বেয়ারা প্রমুখের কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন, যাতে তারা প্রত্যেকের কাজের সমান গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে ও তাদের সম্মান করতে শেখে।
- মা-বাবা ও শিক্ষক শিশুদের বিভিন্ন শ্রমজীবীর কাজ প্রত্যক্ষ করাবেন। তাদের কাছে এসব শ্রমজীবী মানুষের কাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবেন। তাদের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোভাব শ্রদ্ধাপূর্ণ কি না তা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে যাচাই করবেন।

সামাজিক গুণাবলি

মানুষ কখনো একা বাস করতে পারে না। প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে বা বশে আনার জন্য, সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে হয়। আর তখন থেকে শুরু হয় সমাজ বা সামাজিকতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও বন্যপশুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও বন্য পশু শিকার ইত্যাদি প্রতি কাজে দল বা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার সূচনা হয়। সমাজের সকলকে নিয়ে মিলেমিশে থাকা এবং মিলেমিশে কাজ করার জন্য যেসব গুণাবলির প্রয়োজন হয় সেগুলোকে সামাজিক গুণাবলি বলে।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের একজন দক্ষ শিক্ষক সমাজের পথপ্রদর্শক, সমাজ সংস্কারক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর আদর্শে শিক্ষার্থীরা ও সমাজের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অনুপ্রাণিত হন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষই একমাত্র বিবেকসম্পন্ন জীব। মানুষ অনেকগুলো গুণের অধিকারী। কিন্তু একজন শিক্ষককে মানুষের গুণাবলির পাশাপাশি আরো অনেক গুণের অধিকারী হতে হয়, যা তাঁকে এক অনন্য মানুষে পরিণত করে। সমঝোতা, সম্প্রীতি, নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা, মিলেমিশে কাজ করা, অন্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া, যুক্তির মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা ইত্যাদি সামাজিক গুণ মানুষকে মহান করে। শিখন শেখানো কাজে একজন শিক্ষকের সামাজিক গুণাবলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়।

শিশুদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলি বিকাশের উপায়

সমঝোতা, সম্প্রীতি, মিলেমিশে কাজ করার মনোভাব ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলি শিশুদের মধ্যে বিকাশ সাধন আবশ্যিক। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক এবং শিক্ষক-সমাজ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করা সম্ভব। শিক্ষার বিষয় শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ নয়। শিশুর চপল মনের চঞ্চলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের শেখার দুর্বার কৌতূহল ও আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে তাকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে।

- শিক্ষক শিশুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। সমস্যাগ্রস্ত শিশুর সমস্যার কথা জানবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে থাকার জন্য উৎসাহিত করবেন। যেকোনো সমস্যা বা গোলমাল সৃষ্টি হলে সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখবেন।
- শ্রেণিকক্ষে কোনো শিশু কলম, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি আনতে ভুলে গেলে শিক্ষক নিজের কলমটি দেবেন বা সহপাঠীদের কারো এসব জিনিস বেশি থাকলে তা দিয়ে সহায়তা করতে উৎসাহিত করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে অসুস্থ হওয়া শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা অসুস্থ শিশুর মা- বাবাকে ডেকে আনাবেন। প্রয়োজনে ক্লিনিকে বা হাসপাতালে পাঠাবেন।
- শিক্ষার্থীদের সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক সভা, খেলাধুলা প্রভৃতি পরিচালনা করবেন।
- জাতীয় দিবস, ধর্মীয় দিবস উদযাপনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেবেন এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করবেন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবার সাথে শিক্ষার্থীর সমস্যা, লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার কারণ নিয়ে আলাপ করবেন। শিক্ষার্থীকে কাছে বসিয়ে তার কথা শুনবেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

গণতান্ত্রিক মনোভাব

সাধারণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসনকে বোঝায়। আর গণতান্ত্রিক মনোভাব হলো কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া। আমরা পরিবারে ও সমাজে অনেকে মিলে বসবাস করি। বিদ্যালয়েও আমরা অনেকে একসাথে পড়াশুনা করি। এভাবে আমরা সবাই বিভিন্ন দলের (পরিবার, বিদ্যালয়, পাড়া/মহল্লা, সমাজ ইত্যাদি) সদস্য হিসেবে কাজ করি। দলে কাজ করতে গিয়ে সাধারণত আমরা কী দেখি? একটি দলের সদস্য হিসেবে কোনো কিছু করার সময় আমরা নিজেরা মতামত প্রকাশ করি। অন্য সদস্যরাও তাদের মতামত জানায়। সেসব মতামত শুনতে হয়, গুরুত্ব দিতে হয়। অতঃপর দলের বেশিরভাগ সদস্য যেটিকে সমর্থন করে, তার আলোকে কাজটি করা হয়। এভাবে একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব বলে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিতে না পারলে যথার্থ সম্মান পাওয়া যায় না। শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করাও যায় না। তাই আমাদের শিশুদের শৈশবকাল থেকেই গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন করে তুলতে হবে।

শিশুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব তৈরির উপায়

গণতন্ত্রে কাউকে জোর করে কিছু করা হয় না। অধিকাংশ ব্যক্তির মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে সবাই এতে খুশি থাকে। সবাই মিলেমিশে চলতে শেখে যা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে আসে। তাই গণতান্ত্রিক মনোভাব শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। আমরা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে নিজেরা গণতান্ত্রিক আচরণ করার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের উন্মেষ ও বিকাশ করতে পারি। পরমতসহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিক মনোভাব অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। অতএব, পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষণের কৌশলগুলো শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক মনোভাব তৈরির ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নিচের কৌশলগুলো শিশু শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক মনোভাব বিকাশে ভূমিকা রাখবে—

- পরিবারে ঘরের জিনিস কেনা, ঘর সাজানো, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে বাবা-মা, ভাই-বোন ও অন্য সকলে মিলেমিশে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। এ ক্ষেত্রে শিশুদের মতামতকেও গুরুত্ব দেবেন।
- শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে যেমন—শ্রেণিকক্ষ সাজানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চেয়ার-বেঞ্চ গোছানো ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে মতামত নিয়ে সম্পন্ন করবেন।

- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন ইত্যাদি পরিচালনায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে সম্পন্ন করবেন।
- শ্রেণিকক্ষের ক্যাপ্টেন বা দলনেতা নির্বাচনের বেলায় শিক্ষক অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা কৌশল অনুশীলন করবেন।
- শুধু পরিবার বা বিদ্যালয়ে নয়, পাড়া বা মহল্লার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কাজে শিশুদের দলের বেশিরভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবেন।
- রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নাগরিকের মতামতের প্রতিফলন তথা গণতান্ত্রিক মনোভাব কেন থাকা প্রয়োজন তা মা-বাবা ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন। বাস্তব জগৎ থেকে উদাহরণ দিয়ে এর সুবিধা-অসুবিধা তুলে ধরবেন।

পরমতসহিষ্ণুতা

কোনো ব্যক্তির নিজস্ব মতামত, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি বা অনুশীলনের বাইরে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা ইত্যাদি নির্বিশেষে অপরাপর ব্যক্তির মতামত, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, কাজ বা অনুশীলনের প্রতি তার পক্ষপাতহীন, নৈর্ব্যক্তিক ও অনুমোদনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরমতসহিষ্ণুতা হিসেবে অভিহিত করা যায়। পরমতসহিষ্ণুতা হলো একজন ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের বিশ্বাস, কাজ বা অনুশীলনকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দেখার ও সম্মান করতে পারার সামর্থ্য বা অনুশীলন।

শিশুদের পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষণের তাৎপর্য

শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে, পাড়ায় বা মহল্লায় নানা স্বভাবের, নানা বৈশিষ্ট্যের ছেলেমেয়ে থাকে। কেউ ধনী, কেউ গরিব। কেউ মুসলমান, আবার কেউ হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান। কেউ বাঙালি, কেউ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর। কেউ স্বল্পভাষী, কেউ বা বেশি কথা বলতে পছন্দ করে। আবার বিভিন্ন জনের চিন্তা-ভাবনাও বিভিন্ন রকম। এসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের শিশুরা মিলেমিশে চলবে, পড়ালেখা, খেলাধুলা ও কাজ করবে। বিদ্যালয় ও এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সদ্ভাব, সহনশীলতা ও সহযোগিতা। এ জন্য প্রয়োজন তাদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে তোলা। কারণ পরমতসহিষ্ণুতা শিশুদের অন্যের মত গ্রহণ করতে ও সম্মান করতে শেখায়। এ ধরনের মনোভাব শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শিশুদের

পরমতসহিষ্ণু করে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে শ্রেণিকক্ষে, খেলার মাঠে, বিদ্যালয় অথবা পাড়া বা মহল্লায় অন্যের মত শুনতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখাতে হবে। সবার সম্মিলিত মত গ্রহণের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। যদি তার কাজে কোনো ত্রুটি থাকে, সেটিকেও তাকে ও অন্যদের গ্রহণ করতে শিখবে। এভাবে শিক্ষার্থীদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিলেমিশে বসবাসের ও কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক আচরণের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা তাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

শিশুদের পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষণের কতিপয় কৌশল

শিশুদের পরমতসহিষ্ণুতার বিকাশ ও উন্নয়নে মা-বাবা ও শিক্ষকদের নিচের কাজগুলো সহায়ক হবে—

- শিশুর মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বা সে কোনো ভুল করলে আপনি তার প্রতি সহিষ্ণু আচরণ করবেন। অন্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শিশুরা সাধারণত মা-বাবা এবং শিক্ষকদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে শিশুরা আপনাকে অন্যের প্রতি যে ধরনের আচরণ করতে দেখবে, তারাও সেভাবে আচরণ করতে শিখবে। অতএব, মা-বাবা ও শিক্ষকদের সবার সাথে পরমতসহিষ্ণু আচরণ করতে হবে। এজন্য তারা শিশুদের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন-দেবেন তেমনি অপরের মতামত প্রকাশে যাতে তারা বাধা না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- শিশু তার বড় বা ছোট ভাই-বোন এবং সহপাঠীদের সাথে কেমন আচরণ করে তা পর্যবেক্ষণে রাখুন। কোনোরূপ অসঙ্গত আচরণ করলে তাকে সেই আচরণের প্রভাব বুঝিয়ে বলুন। তার সাথে রাগারাগি করা বা ধমক দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ভিন্ন ধর্ম, গোত্র বা সংস্কৃতির মানুষ ও মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান। শিশুদের সামনে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো তুলে ধরুন। আপনার শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি শিশুদেরকে ভিন্ন ধর্ম, গোত্র বা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করবে।
- শিশু বা শিক্ষার্থীকে শুধু ঘরের বদ্ধ পরিবেশ নয়, ঘরের বাইরে খেলার সুযোগ করে দিন। ঘরের বাইরে খেলাধুলায় সে অনেক শিশুর সাথে মেলামেশার সুযোগ পায়। এটি তাকে তার চারপাশের সকল ভিন্ন ধরনের শিশুর সাথে সহানুভূতিশীল ও পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষার সুযোগ এনে দেবে।
- শিশুকে তার নতুন বন্ধুবান্ধব বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার মেন্যু ঠিক করা, প্রোগ্রাম আয়োজন করা, খাবার রান্না করা, টেবিল গোছানো ইত্যাদি কাজ করতে দিয়ে পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করান।
- খেলার সময় শিশুদের খেলনা সামগ্রী আদান-প্রদানে উৎসাহিত করুন। একটি বিশেষ খেলনা কেবল একজনের দখলে যাতে সব সময় না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখুন।

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে খেলার মাঠে শিশুদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দেবেন। শিশুরা অন্যের মতামত গুনছে কি না তা খেয়াল করবেন। অন্যের মতামত শোনা ও তা শ্রদ্ধা করতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে বা খেলার মাঠে কেউ অন্যের মত প্রকাশে বাধা দিলে বা নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা দেখালে তাকে শাস্ত করুন। নরম স্বরে হাসি-খুশিভাবে তাকে তার ঐ কাজের পেছনে যুক্তি কী তা ব্যাখ্যা করতে বলুন। তার যুক্তি অন্যায়ের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা যাচাই করুন। অতঃপর আপনি সবাইকে এই বোধে অনুপ্রাণিত করুন যে, আমরা কখনো একে অন্যের মত প্রকাশে কোনো বাধা দেব না বরং যৌক্তিক মতামত বা সিদ্ধান্ত যার-ই হোক না কেন তা গ্রহণ করতে হবে।
- কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে যৌথ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে শিক্ষার্থীদের তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে পরমতসহিষ্ণুতার ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে উৎসাহিত করুন।
- ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে পরমতসহিষ্ণুতার ভূমিকাভিনয় করান।
- কেউ ভুল মতামত দিলে বা কারো কোনো কাজে ভুল হলে তা নিয়ে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা হাসি-ঠাট্টা না করার শিক্ষা দিন।

বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ

বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃসুলভ, বন্ধুভাবাপন্ন, শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিমূলক সহযোগিতার চেতনা। আরো সহজভাবে বলা যায়, বিশ্বের মানুষ সংঘবদ্ধভাবে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে একে অন্যের সাথে যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলে তা-ই হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব। এক কথায়, পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মাঝে সমঝোতা ও সহযোগিতা বজায় রাখাকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বলে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং সার্ক বা আসিয়ান-এর মতো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বিশ্বভ্রাতৃত্ব জোরদার করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। রেডক্রস, রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদি বেসরকারি সংগঠন বিশ্বভ্রাতৃত্ব জোরদারে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রয়োজন কেন?

আজকের দুনিয়ায় অনেক জাতি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। কিন্তু এটিও বাস্তবতা যে, অনেক জাতি নানা দিক থেকে পেছনে পড়ে আছে। পৃথিবীতে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার আজও নিশ্চিত হয়নি। সকল শিশুকে আজও সাক্ষর করা যায়নি। পৃথিবীর কিছু অংশের মানুষ সম্পদের অপচয় করছে, কিছু অংশের মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ চলছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণহানি ও বিপুল সম্পদহানি ঘটছে। নিত্যনতুন সমস্যা ও ইস্যু পৃথিবীর অস্তিত্বকে হুমকির মুখোমুখি করছে। মানুষ হিসেবে আমরা যদি এসব বিষয়ে উদাসীন থাকি অথবা যার সমস্যা তার দায় হিসেবে বিষয়গুলোকে দেখি, তাহলে তা একাধারে হবে মানবতার বিপর্যয়; অন্যদিকে উন্নত, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পৃথিবীতে আমাদের বসবাসের প্রত্যাশা হবে সুদূরপর্যন্ত। অথচ আমরা সবাই যদি ভ্রাতৃসুলভ ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে একসাথে

মিলেমিশে কাজ করি, পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই, তাহলে পুরো পৃথিবীর চেহারা ইতিবাচকভাবে বদলে দিতে পারি। যেমন-আমাদের সমবেত প্রয়াসে আমরা পৃথিবীর অনাহারী মানুষদের খাদ্য সমস্যা দূর করতে পারি। বিশ্বকে নিরক্ষরমুক্ত করতে পারি। শান্তিপ্রিয় সকল মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদ পৃথিবীতে যুদ্ধ, সংঘাত ও উত্তেজনা কমিয়ে দিতে পারে। সকল রাষ্ট্র ও তাদের নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ পৃথিবীকে বৈশ্বিক উষ্ণতা তথা পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে। খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রসার ঘটাতে পারি। কাজেই, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যেমন, তেমনি সকল রাষ্ট্রের মানুষের উচিত হবে সবার মাঝে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, পারস্পরিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা। আমাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য, অপরের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির এবং পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যাণসাধনের জন্য সবাইকে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত থাকতে হবে।

শিশুদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো

আমাদের আজকের শিশুরা আগামীতে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। তাদেরকে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে, ভ্রাতৃসুলভ ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সবার সাথে একত্রে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। সেজন্য শৈশবকাল থেকেই তাদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্নভাবে শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

- বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (যেমন-সার্ক, আসিয়ান, ইউনিসেফ প্রভৃতি) সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে এগুলো আমাদের জীবনমানের যে উন্নয়ন করেছে শিক্ষক তা শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।
- পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে শিক্ষকমন্ডলী নিজেদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের সাধ্যমতো চাঁদা সংগ্রহ করবেন। তারা তাদের সাথে নিয়ে এলাকাবাসীর কাছ থেকেও তা সংগ্রহ করতে পারেন। সংগৃহীত অর্থ দুর্গতদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নিকটস্থ রেডক্রস বা সরকারি ত্রাণ কেন্দ্রে জমা দেবেন।
- রেডিও, টেলিভিশনে কোনো স্থানে দুর্ঘটনার সংবাদ শুনলে বা সংবাদপত্র পড়ে জানলে তা শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন এবং সবাই মিলে সমবেদনা প্রকাশ করবেন।

- যেকোনো জাতির বা ব্যক্তির কোনো কৃতিত্বপূর্ণ উদ্ভাবন বা সাফল্য যা সামগ্রিকভাবে মানুষের জন্য কল্যাণকর এমন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করবেন।
- সকলের জন্য ভালো কিছু করা ও সকল সুবিধা একসাথে উপভোগ করার মানসিকতা গড়ে তুলবেন।

সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। মানুষের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে। ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, দেশের প্রতি ভালোবাসা গভীর করে। মানুষের প্রতি সদাচরণ করতে শেখায়। জীবনে শৃঙ্খলা আনে। পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে। সুতরাং আমরা পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অত্যাৱশ্যকীয় বিভিন্ন মূল্যবোধ যেমন-সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, সদাচরণ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, একতা, সংঘবদ্ধতা, সহযোগিতা, পরোপকার ইত্যাদির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে এবং অনুশীলন করাতে সর্বোত্তমভাবে সচেষ্ট থাকব।

অধ্যায় ৫

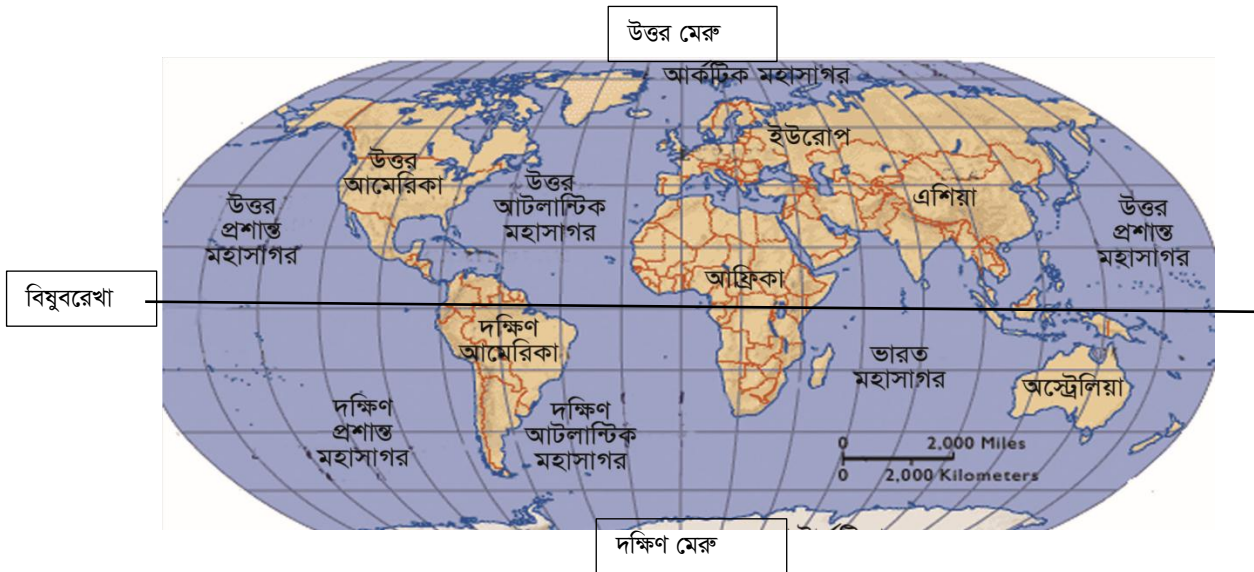
পৃথিবী: মহাদেশ ও মহাসাগর

পৃথিবী

আমরা যখন বাংলাদেশের এক স্থান থেকে অন্য কোন স্থানে যেতে চাই তখন আমাদের দীর্ঘ পথ, প্রচুর নদী, বড় বড় শস্যক্ষেত পার হয়ে যাতে হয়। তখন দেশটিকে আমাদের কাছে বেশ বড় মনে হয়। এরকম ছোট বড় বহুদেশের সমন্বয়ে এশিয়া মহাদেশ গড়ে উঠেছে। আমাদের এই বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। পৃথিবীতে রয়েছে এরকম সাতটি বড় বড় মহাদেশ আর পাঁচটি বিশাল মহাসাগর। এবার বুঝতে পারছেন নিশ্চয় যে পৃথিবীটা কত বিশাল আর সেই তুলনায় আমাদের এই বাংলাদেশ একটা ছোট্ট দেশ।

পৃথিবীর বিশালতা আমরা অনেক সময় অনুমান করতেও পারি না। এই পৃথিবীকেই অনেক সময় ছোট মনে হবে যখন আমরা আমাদের এই পৃথিবীকে সৌরপরিবারের একটি সদস্য হিসাবে দেখবো। পৃথিবী একা নয় এ সৌরপরিবারে-যাকে আমরা 'সৌরজগত' নামে চিনি সেখানে রয়েছে অনেক গ্রহ-উপগ্রহ। এই সৌরপরিবারের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য ও পৃথিবীসহ আটটি গ্রহ ও অজস্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি। এখানেই শেষ নয়, এই সৌরপরিবারটি আবার ছায়াপথ (Milky way) নামে একটি গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত, যেখানে অনুমানিক ৪০০ বিলিয়ন জ্যোতিষ্ক রয়েছে (NASA)। এরকম ১০০-২০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সির সমাবেশে তৈরি হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (Universe)। এবার ভাবুনতো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়!

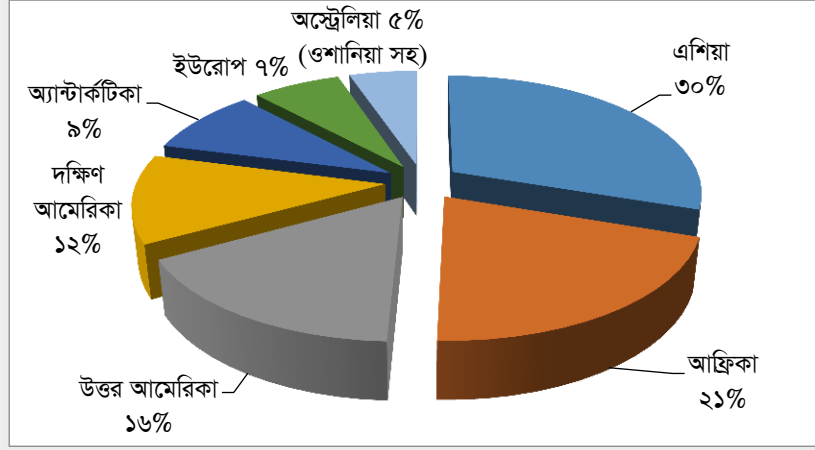
পৃথিবীর মোট এলাকার প্রায় ৭১% হলো জলভূমি, বাকি প্রায় ২৯% হলো স্থলভূমি। তাই বলা হয় পৃথিবীর তিন ভাগ পানি ও এক ভাগ স্থল। এই বিশাল জলরাশির ৯৭.৫% লবণাক্ত সমুদ্রের পানি। মাত্র ২.৫% পানি সুপেয় বা পানের উপযোগী। এই সুপেয় পানির মাঝে আবার ৬৮.৭% ই বরফ আকারে জমে আছে দুই মেরু আর উঁচু সব পাহাড়ের চূড়ায়। দুই মেরু উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। কোন মানচিত্র বা গ্লোবের উত্তর দিক হলো বিষুব বা নিরক্ষরেখা থেকে উপরের দিকে। পৃথিবীর ঠিক মাঝ বরাবর চলে গেছে বিষুব বা নিরক্ষরেখা। এই বিষুবরেখা পৃথিবীকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করেছে। পৃথিবীর স্থল ভাগকে সাতটি মহাদেশ ও জলভাগকে পাঁচটি মহাসাগরে ভাগ করা হয়েছে।



পৃথিবী এবং মহাদেশ ও মহাসাগর

মহাদেশ

প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে পৃথিবীকে সাতটি মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে। পাই (pie) চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মহাদেশের আয়তনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।



আয়তন অনুযায়ী মহাদেশসমূহের তুলনামূলক চিত্র

এশিয়া মহাদেশ

উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশটি আয়তনে ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। ভূ-ভাগের প্রায় ৩০ ভাগ জুড়ে এ মহাদেশটির অবস্থান। এ মহাদেশের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিমে আফ্রিকা ও লোহিত সাগর, উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ইউরোপ মহাদেশের সাথে স্থলভাগ দ্বারা যুক্ত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপকে একসাথে ইউরেশিয়া বলা হয়। এশিয়া মহাদেশে মোট ৪৭টি দেশ আছে। এর আয়তন ৪,৯৭,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এছাড়া তুরস্ক ও রাশিয়ান ফেডারেশন এর বৃহদাংশ এই মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত হলেও কিছুটা অংশ ইউরোপে অবস্থিত। এ মহাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ হলো বাংলাদেশ, চীন, ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত ইত্যাদি। বাংলাদেশ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

এশিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ৪.৪৬৩ বিলিয়ন অর্থাৎ ৪ শত ৪৬ কোটির কিছু বেশি। পৃথিবীর প্রায় ৬০% ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করে। চীন এই মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশ। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ। পৃথিবীর ১০টি অধিক জনসংখ্যাবহুল দেশের মধ্যে সাতটিই এশিয়ায় অবস্থিত। যেমন- চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জাপান, ফিলিপিনস, ভিয়েতনাম।



মানচিত্র: এশিয়া মহাদেশ

আমরা যদি এশিয়ার ভূপ্রকৃতির মানচিত্রের দিকে তাকাই আমাদের চোখে পড়বে, ভারত-নেপাল-ভূটান এর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট, এর উচ্চতা ২৯,০৩৫ ফুট।



চিত্র: মাউন্ট এভারেস্ট

মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে হিন্দুকুশ-কারাকোরাম-আলতাই-তিয়েনশান পর্বতমালা। বিশাল এলাকা জুড়ে পামির ও তিব্বতের মালভূমি পৃথিবীর ছাদের মতো অবস্থান করছে। ছোটবড় বিভিন্ন মরুভূমির মধ্যে রয়েছে, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি এগুলো হলো চীনের গোবি মরুভূমি, মধ্যপ্রাচ্যের আরব মরুভূমি এবং ভারতের রাজস্থান মরুভূমি। এছাড়া রয়েছে বিস্তৃত সব প্লাবন সমভূমি অঞ্চল। এশিয়ায় অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ নদী আছে। এর প্রধান তিনটি নদী, গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু হিমালয়ে উৎপত্তি হয়েছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, চীনের মেকং, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং; পাকিস্তানের সিন্ধু, ভারতের গঙ্গা, মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উল্লেখযোগ্য। চীনের ইয়াংসিকিয়াং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী, পৃথিবীর মধ্যে এর স্থান তৃতীয়।

এশিয়ার বিশালতার জন্য এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু লক্ষ করা যায়। যেমন-ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় সারা বছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশ ও আশপাশের দেশগুলোতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে অনেক বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে বৃষ্টি খুব কম হয়। বৃষ্টিহীন এলাকায় এশিয়ার উল্লেখযোগ্য মরুভূমিগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এশিয়ার উত্তর দিকে সাইবেরিয়া অবস্থিত। সাইবেরিয়া ও এর আশপাশে খুব ঠান্ডা। তীব্র শীতের কারণে সেখানে শীতের সময় প্রচুর তুষারপাত হয়। এছাড়া মধ্য এশিয়ার পর্বত শিখরও সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে।

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বিশেষ করে নিরক্ষরেখা বরাবর যে সকল দ্বীপ রয়েছে সেখানে অধিক তাপ ও বৃষ্টির জন্য রেইন ফরেস্ট বা চিরসবুজ অরণ্য গড়ে উঠেছে। এতে হাতি, হরিণ, বানর, বিভিন্ন ধরনের সাপ ও অন্যান্য প্রাণী পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। চীন দেশের পান্ডা, ভারতের ময়ূর আর মরু অঞ্চলের উটও এশিয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

এশিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ ধান এশিয়ায় উৎপাদিত হয়। চীন, ভারত, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষদের ভাতই প্রধান খাদ্য। গম এই মহাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে গম প্রধান খাদ্যশস্য। উল্লেখ্য যে, এই দুটি শস্যের আদি উৎসও এশিয়া মহাদেশেই। এছাড়া প্রচুর ভুট্টাও এ মহাদেশে উৎপাদিত হয়। মসলা উৎপাদনের জন্য এশিয়া মহাদেশ বিখ্যাত। সমুদ্র তীরের দেশগুলোতে অনেক নারিকেল জন্মে। প্রধান অর্থকরী ফসলগুলো হলো পাট, তুলা, রাবার, চা, তামাক ইত্যাদি। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে কফি, আখ ও রেশম জন্মে।

এশিয়া মহাদেশে প্রচুর খনিজদ্রব্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। পৃথিবীর অধিকাংশ গ্যাস ও তেল মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়। এছাড়া তামা, সোনা, রূপা, অত্র, ম্যাংগানিজ, টিন, হীরা প্রভৃতি খনিজদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শিল্পে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত। এ মহাদেশের জাপান, চীন, ভারত, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক শিল্প আছে। এশিয়ার শিল্পগুলোর মধ্যে লোহা ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পশম শিল্প, কাগজ ও পাট শিল্প উল্লেখযোগ্য। এই মহাদেশের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এশিয়ায় দুই হাজার একশরও বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আরবি, চায়নিজ, হিন্দি, বাংলা, জাপানিজ, রুশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অনেকগুলো প্রাচীন সভ্যতা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত, যেমন-মেসোপটেমীয় সভ্যতা, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, চীন সভ্যতা প্রভৃতি।

আফ্রিকা মহাদেশ

আফ্রিকা মহাদেশের মাঝ বরাবর নিরক্ষরেখা চলে গেছে তাই এর অর্ধেক উত্তর গোলার্ধে ও বাকি অর্ধেক দক্ষিণ গোলার্ধে পড়েছে। আয়তন এবং জনসংখ্যা উভয় দিক থেকে এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এটি পৃথিবীর প্রায় স্থলভাগের ২০ ভাগ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। আয়তন প্রায় ৩,০২,২১,৫৩২ বর্গকিলোমিটার। আফ্রিকায় ৫৪টি স্বাধীন দেশ আছে। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, উত্তর-পূর্বে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল এবং সিনাই উপত্যকা; পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর আফ্রিকাকে ঘিরে রেখেছে। আফ্রিকার দীর্ঘতম নদী নীল এবং উচ্চতম পর্বত কিলিমানজারো। জনসংখ্যা প্রায় ১০৩ কোটি, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ১৫%। এটি পৃথিবীর ঊষ্মতম মহাদেশ। এর প্রায় ৬০% এলাকাই মরুভূমি ও শুষ্ক। এখানকার সাহারা ও কালাহারি মরুভূমির নাম সবারই জানা। আফ্রিকার নিরক্ষরেখার কাছে ঘননিবিড় অরণ্য রয়েছে, যেখানে বৃক্ষচারি সব প্রাণীর বাস। অনেক বিষাক্ত কীট-পতঙ্গেরও এটা অভয়ারণ্য।



মানচিত্র: আফ্রিকা

আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকায় সাভানা নামের তৃণভূমি রয়েছে, এ অঞ্চলে সিংহ, হায়েনা, চিতাবাঘ, জিরাফ, গরিলা, উট, বেবুন, জেব্রাসহ অজস্র তৃণভোজী এবং মাংসাশী প্রাণী বাস করে। আফ্রিকায় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধরনের এবং ঘনত্বের বুনো প্রাণী বাস করে।

আফ্রিকার দেশগুলোতে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। তবে বেশির ভাগ লোক ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এরপর আছে খ্রিষ্ট ধর্ম। এখানে প্রায় ২০০০ ভাষা প্রচলিত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশ হচ্ছে—আলজেরিয়া, লিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, নাইজেরিয়া, সুদান, মিসর, অ্যাঙ্গোলা, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ

আফ্রিকা, উগান্ডা, নামিবিয়া ইত্যাদি। আফ্রিকা খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। বিপুল তেল, গ্যাস, স্বর্ণ, হীরক, কয়লা, ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ আফ্রিকাতে উত্তোলিত হয়। আফ্রিকাতেই আদি মানব সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল বলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন। মিসরীয় সভ্যতার জন্ম আফ্রিকাতেই। এছাড়াও আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া), কার্থেজ (বর্তমানে তিউনেশিয়ায় অবস্থিত) এর মতো প্রাচীন সভ্যতার জন্মও আফ্রিকাতে।

উত্তর আমেরিকা

উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এ মহাদেশের উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, পূর্বে আটলান্টিক, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত। এটি আয়তনে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম এবং জনসংখ্যায় চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। এ মহাদেশের আয়তন প্রায় ২,৪৭,০৯,০০০ বর্গকিলোমিটার। এ মহাদেশে মোট ২৩টি দেশ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো উল্লেখযোগ্য। এখানকার বড় বড় শহর হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, মেক্সিকো সিটি, নিউইয়র্ক এবং টরেন্টো।



মানচিত্র: উত্তর আমেরিকা

উত্তর আমেরিকার বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতিকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন-

১. ক্যানাডিয়ান শিল্ড : মূলত ক্যানাডার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পূর্ব দিক জুড়ে রয়েছে, যা দক্ষিণের হ্রদ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমবাহ দ্বারা এ অঞ্চলের উপরের শিলা অপসারিত হওয়ায় নিচের কঠিন শিলা দৃষ্টিগোচর হয়।

২. দক্ষিণ-পূর্বের এপিলেশিয়ান পর্বতমালা : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বের বেশ কতোগুলো অঙ্গরাজ্যের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত।

৩.মধ্যভাগের বিস্তৃত সমভূমি : রকি পর্বতমালা থেকে বাহিত পলি মাটি দ্বারা গঠিত উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগ জুড়ে রয়েছে মধ্যভাগের বিস্তৃত সমভূমি বা গ্রেটপ্লেন। এ অঞ্চলটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক ক্রমশ ঢালু হয়ে যাওয়া মহাদেশের এ অংশের পূর্বপার্শ্বে পাতা বরা গাছের বিশাল অরণ্য ও কৃষিজমি থাকলেও পশ্চিমের দিকে ক্রমে তাহাস পেয়েছে এবং তৃণভূমির পরিমাণ বেড়েছে।

৪. পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চল : এ অঞ্চলের প্রধান পর্বতমালা হলো রকি, যা কানাডার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হয়ে নিউ মেক্সিকো পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলবার্ট। এ পর্বতমালার জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

৫. উপকূলীয় সমভূমি: দক্ষিণের মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল থেকে উত্তরের আটলান্টিকের উপকূলের নিউজার্সি পর্যন্ত এ সমভূমি বিস্তৃত।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সীমানা বরাবর পাচটি বড় বড় হ্রদ রয়েছে। এরকম ওন্টারিও ও ইরি হ্রদের মাঝামাঝি নায়াগ্রা জলপ্রপাত পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিদর্শন।

জনসংখ্যা প্রায় ৫২ কোটি ৮৭ লক্ষ, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৭.৫ ভাগ। এ মহাদেশের অধিবাসীরা প্রধানত খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। বিপুল পরিমাণ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ রয়েছে এ মহাদেশে। পৃথিবীর উচ্চতম বৃক্ষ রেড উড এ মহাদেশে জন্মায়। আদি বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বড় অংশই উপনিবেশকারীদের হাতে বিলুপ্ত হয়েছে। মেক্সিকোয় অবস্থিত বিলুপ্ত আজটেক সভ্যতার নিদর্শন এ মহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

দক্ষিণ আমেরিকা

এ মহাদেশের অধিকাংশ স্থানই দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। আয়তন ১,৭৮,৪০,০০০ বর্গকিলোমিটার। এর পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর ও উত্তর-পশ্চিমে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকায় ১২টি দেশ আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশ হলো ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, কলাম্বিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, পেরু ইত্যাদি। উত্তর আমেরিকার যেমন রকি পর্বতমালা দক্ষিণ আমেরিকার তেমন এন্ডিজ পর্বতমালা পশ্চিম উপকূল বরাবর উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর সবচাইতে শুষ্ক মরুভূমি আটাকামা এই মহাদেশেই অবস্থিত। এ মহাদেশের আমাজান অরণ্য বিশালতার জন্য সুখ্যাত। আমাজান নদীও পৃথিবীর বিখ্যাত নদী। লিমা, অ্যানাকোণ্ডা, জাণ্ডয়ার, টাপিরসহ অজস্র প্রাণীর বাস এই ঘন অরণ্যে।



ব্রাজিলের প্রধান ভাষা পর্তুগিজ, বাকি অন্যান্য দেশগুলোতে স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত। অনেকগুলো আদিবাসী ভাষা বিলুপ্ত হলেও অসংখ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে। এই মহাদেশে অনেকগুলো প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। এদের মধ্যে বিলুপ্ত মায়া, ইনকা সভ্যতা জগৎ বিখ্যাত। জনসংখ্যা প্রায় ৩৯ কোটি ২৫ লক্ষ।

মানচিত্র: দক্ষিণ আমেরিকা

ইউরোপ

পৃথিবীর মহাদেশগুলোর মধ্যে আয়তনের দিক দিয়ে ইউরোপ মহাদেশের স্থান ষষ্ঠ। এর উত্তরে আর্কটিক বা উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগর। পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর, ইউরাল নদী ও ইউরাল পর্বত এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। আয়তন ১,০১,৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার। ইউরোপের তটরেখা যথেষ্ট ভগ্ন এবং সুদীর্ঘ। অনেক জায়গায় মহাদেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত সাগর, উপসাগর প্রবেশ করেছে। এখানকার পর্বতমালা গুলোর মধ্যে আল্পস, কার্পেথিয়ান, ককেশাস ও ইউরাল উল্লেখযোগ্য। দানিযুব, ভল্গা, রাইন, রোন উল্লেখযোগ্য নদী। এখানকার দীর্ঘতম নদী ভল্গা।

জনসংখ্যার (৭৩ কোটি ৯০ লক্ষ) দিক দিয়ে এটি তৃতীয় ঘনত্বপূর্ণ মহাদেশ। ইউরোপে ছোট-বড় মিলিয়ে ৫০টি দেশ আছে। এর মধ্যে রাশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, যদিও এর বৃহদাংশ ভূখণ্ড এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের। তবে যতই উত্তরে যাওয়া যায় ততই শীতের প্রকোপ বাড়তে থাকে এবং একদম উত্তর প্রান্ত বরফে ঢাকা থাকে। শীতের মাসগুলোতে এ মহাদেশের উত্তরের দেশগুলোতে যেমন নরওয়ে ও সুইডেনে সূর্য খুবই অল্পসময়ের জন্য দেখা দেয়, আবার গরমের সময় ঘড়ির কাটায় যখন রাত তখনও নিচ আকাশে সূর্যের দেখা মিলে। তাই এসব দেশকে অনেক সময় নিশিথ সূর্যের দেশ বলা হয়।



মানচিত্র: ইউরোপ মহাদেশ

প্রায় ৫০ টি দেশের এই মহাদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৩টি ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধান ভাষাগুলো হলো-ইংলিশ, ফরাসি, জার্মান, গ্রিক, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, রুশ ইত্যাদি। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ (UK) ইউরোপের মূল ভূখন্ডের বাইরে অবস্থিত হলেও এ মহাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপে প্রচুর কয়লা এবং লৌহ পাওয়া যায়। সমুদ্রভাগে বিপুল তেলের মজুদও আবিষ্কৃত হয়েছে। আরো আছে কপার, জিংক, তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ। কৃষিপণ্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, বার্লি উল্লেখযোগ্য। গ্রিস প্রাচীন পৃথিবীর বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার পীঠস্থান।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া একাধারে একটি দেশ আবার একটি মহাদেশও। এটি ওশেনিয়ার অন্তর্ভুক্ত, ভারত ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার দ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়া সহ সমগ্র অঞ্চলটি ওশেনিয়া নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। আয়তন ৮৬,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার।



মানচিত্র: অস্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়া

উত্তর-পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন উপকূল বরাবর প্রবাল প্রাচীর বা ‘গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ’ অন্যতম প্রাকৃতিক নিদর্শন। এ মহাদেশের মধ্যভাগের বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। গ্রেট ডিভাইডিং রেন্জ এর মতো উচু পর্বতও এখানে রয়েছে। জনসংখ্যা ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ। ভাষা হিসেবে ওশেনিয়ার দেশগুলোতে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, পলিনেশিয়ান ইত্যাদি প্রচলিত আছে।

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ

পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মহাদেশ। এটি ওশেনিয়ার চেয়ে বড়। দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুকে ঘিরে এর অবস্থান। এর চারপাশে দক্ষিণ মহাসাগর অবস্থিত।



মানচিত্র : এন্টার্কটিকা

প্রায় ৯৮% এলাকা সারা বছর বরফে আচ্ছাদিত থাকে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো হলো দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা। এখানে কোনো শহর বা গ্রাম নেই। এ মহাদেশে স্থায়ী ভাবে বসতি গড়ে উঠেনি। কিছু কিছু গবেষক, জার্নালিস্ট ও পর্যটক অস্থায়ী ভাবে এখানে বাস করেন।

মহাসাগর

পৃথিবীর বিশাল জলভাগগুলোকে বলে মহাসাগর। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর আছে। এগুলো হলো প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর। পৃথিবীর মানচিত্রে মহাসাগরগুলো দেখানো হয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগর: পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব পাশে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিমে এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর অবস্থিত।

আটলান্টিক মহাসাগর: এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। অনেকটা ইংরেজির ‘S’ অক্ষরের মতো দেখতে এই মহাসাগরটির পূর্ব উপকূলে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত।

ভারত মহাসাগর: এটি তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। দক্ষিণ মহাসাগর থেকে উত্তরে ভারত পর্যন্ত এ মহাসাগরটি বিস্তৃত। এটি অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে মিলেছে।

আর্কটিক মহাসাগর: মহাসাগরগুলোর মধ্যে এটি ক্ষুদ্রতম। এটি উত্তর আমেরিকা এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও এশিয়ার উত্তরে অবস্থিত। গ্রিনল্যান্ডে ও আইসল্যান্ডের কাছে আটলান্টিক এবং বেরিং স্ট্রেইটের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে মিলেছে। এ মহাসাগরটি আংশিকভাবে বরফে ঢাকা যা ঋতুভেদে কম-বেশি হয়। অনেকে একে মহাসাগর বলতে নারাজ। কারণ এর চারদিকে স্থলভূমির পরিমাণ বেশি এবং অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় এর পানিপ্রবাহ অনেক কম।

দক্ষিণ মহাসাগর: এটি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের চারদিক জুড়ে অবস্থিত। আর্কটিকের মতো এটিও আংশিকভাবে বরফে ঢাকা থাকে, যা ঋতুভেদে বিভিন্ন রকম হয়।

আয়তন অনুসারে মহাসাগরের অবস্থান

মহাসাগর	আয়তন (বর্গকিলোমিটার)	গভীরতম স্থান
প্রশান্ত মহাসাগর	১৬,৫২,৫০,০০০ বর্গ কিমি	Mariana Trench-১০,৯১১ মিটার গড় গভীরতা-৪১০৮ মি.
আটলান্টিক মহাসাগর	১০,৬৪,০০,০০০ বর্গ কিমি	Milwaukee-৮,৩৮০ মিটার গড় গভীরতা-৩৩৩৯ মি:
ভারত মহাসাগর	৭,৩৫,৫৬,০০০ বর্গ কিমি	Diamantina-৮০৪ ৭ মিটার গড় গভীরতা-৩৮৯০ মি
দক্ষিণ মহাসাগর	২,০৩,২৭,০০০ বর্গ কিমি	South sandwich-৭৩২৬ মিটার গড় গভীরতা-৪৫০০ মি
আর্কটিক মহাসাগর	১,৪০,৫৬,০০০ বর্গ কিমি	Eurasia basin-৫৪৫০ মিটার গড় গভীরতা-১০৩৮ মি

মহাসাগরের গুরুত্ব

মহাসাগরগুলো সামুদ্রিক মৎস্যের বিশাল ভান্ডার। মানুষের খাদ্যের একটা বিরাট অংশ এই মহাসাগরগুলো সরবরাহ করে আসছে। মহাসাগরসংলগ্ন অনেক দেশ আছে যারা মৎস্য শিল্পে উন্নত এবং মৎস্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

মহাসাগরগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার উষ্ণ ও শীতল স্রোতধারা। এই স্রোতগুলোর অনুকূলে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থানে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়। সেসব স্থানে প্রচুর মাছের খাবার পাওয়া যায়। সে জন্য এইসব স্থানে মৎস্য চারণক্ষেত্র গড়ে ওঠে। যেমন-নিউফাউন্ডল্যান্ড, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, নরওয়ে উপকূলে মৎস্য চারণক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

- সমুদ্রসংলগ্ন দেশ বা দেশের অংশে মহাসাগরগুলোর প্রভাব বিশাল। কোনো দেশ সমুদ্র/মহাসাগরসংলগ্ন হলে স্থল ও জলভাগের তাপমাত্রা তারতম্যজনিত কারণে সেইখানে সমুদ্র ও স্থল বায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রচণ্ড শীতে বা প্রচণ্ড গরমে সমুদ্র বায়ুর প্রভাবে সেই স্থানের শীতের তীব্রতা এবং গরমের তীব্রতা সহনীয় রাখতে মহাসাগরগুলো বিরাট ভূমিকা রাখে।
- মহাসাগর থেকে আসা বায়ুপ্রবাহ প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে এবং মহাদেশের উপকূলীয় অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাতে সহায়তা করে।
- কোনো শীতল স্থানের পাশ দিয়ে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হলে সেই স্থান যতটা শীতল হওয়ার কথা তা হয় না, বরং কিছুটা উষ্ণ হয়ে ওঠে। আবার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলের পাশ দিয়ে শীতল স্রোত প্রবাহিত হলে সেই স্থানের শীতের তীব্রতা বাড়ে।

মহাসাগরগুলো জীববৈচিত্র্যের বিশাল ভাণ্ডার। মহাসাগরগুলো মানুষের যেমন গবেষণার বিষয় তেমনি এগুলো পর্যটকদের জন্যও বিশেষ আকর্ষণীয়। জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণ এমনকি সমুদ্র তলদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করায় অনেক দেশ পর্যটকদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সাগর-উপসাগরসংলগ্ন বিখ্যাত সমুদ্র সৈকতসমূহ পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ।

অধ্যায় ৬

বাংলাদেশের ইতিহাস

প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বর্তমান যে জীবনধারা তার শুরু ও বিকাশ হঠাৎ করে হয়নি। প্রাচীন বাংলার মানুষের দ্বারা রচিত হয়েছে এর ভিত্তি আর কালে কালে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ হয়েছে। এজন্য বলা যায় যে, আজকের বাংলাদেশের সমাজে অনেক পরিবর্তন এলেও আগের দিনের অনেক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে আলাদা ধারাও লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আর মানুষের এই জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ ঘটে সংস্কৃতির। বর্তমান বাংলাদেশের সংস্কৃতি গভীরভাবে লক্ষ করলে এতে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জীবনধারা ও চেতনার বিকাশ প্রাচীন বাংলা থেকে শুরু হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগের পাল রাজাদের শাসনকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর আগের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। এ সময়কালে কোনো শাসক দীর্ঘদিন সমগ্র বাংলা জুড়ে শাসন করতে পারেননি। তাই বিচ্ছিন্নভাবেই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে। মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের অবসানের পর এক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটে কিছু স্বাধীন রাজ্যের। স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে উত্তর বাংলার রাজা শশাংক ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্য জুড়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রায় একশত বছর এ অবস্থার মধ্যে কাটে। অতঃপর গোপাল নামে এক নেতা এ অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান এবং পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বারো শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের পতন ঘটে। পাল শাসন যুগেই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। এরপর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে আগত সেন বংশ পূর্ব বাংলায় রাজ্য স্থাপন করে। দীর্ঘকাল বাংলায় সেন শাসন অব্যাহত ছিল। তের শতকের প্রথম দশকে মুসলমান শক্তির হাতে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

মৌর্য ও গুপ্তযুগে বাংলা

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-২৬ অব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় হতে এ যুগের প্রকৃত ইতিহাসের রূপ পরিগ্রহ করে। আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের মাত্র দুই বছর পর ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের উপর মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিঃ পূঃ)। অঞ্চলটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত

হয়েছিল। প্রাচীন পুন্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও মৌর্য শাসন কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ), তাম্রলিপ্ত (হুগলী) ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ববাংলা) অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গুপ্ত ও পরে কন্ব বংশের আবির্ভাব ঘটে। এরপর বেশকিটি বিদেশি শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এদের মধ্যে গ্রীক, শক, পল্লব, কুষাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২০ খ্রিস্টাব্দে। তখন বাংলায় বেশ কিছু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট রাজ্য ও পশ্চিম বাংলার পুন্ড্রনগর রাজ্য উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালেই উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলা জয় করা হলেও সমতট একটি করদ রাজ্য ছিল। সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকাল হতে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি ‘প্রদেশ’ বা ‘ভুক্তি’ হিসেবে পরিগণিত হতো। মৌর্যদের মত এদেশে গুপ্তদের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়ের পুন্ড্রনগর।

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা ও স্বাধীন বঙ্গরাজ্য

পাঁচ শতকে দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হুন ও ষষ্ঠ শতকে মালবের যশোবর্মণের আক্রমণের ফলে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্তদের পর সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সে সুযোগে বাংলাদেশে দুটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এর একটি হলো বঙ্গ। এর অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ববাংলা ও পশ্চিম-বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। দ্বিতীয় রাজ্যের নাম গৌড়। এর অবস্থান ছিল বাংলার পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তাম্রশাসন বা তামার পাতে খোদাই করা রাজার বিভিন্ন ঘোষণা ও নির্দেশ থেকে জানা যায় যে, গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিন জন রাজা স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য শাসন করতেন। এঁরা সবাই ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করে ছিলেন। তাঁদের রাজত্ব কাল ছিল ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। স্বাধীন গৌড়রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ছয় শতকে ‘পরবর্তী গুপ্তবংশ’ বলে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতাবিস্তার করেছিলেন। ছয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলই গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। মৌখরী ও পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরুষানুক্রমিক সংঘর্ষ এবং উত্তর থেকে তিব্বতীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে চালুক্য রাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায় গুপ্ত বংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শশাংক নামে জনৈক সামন্ত সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

মাৎস্যন্যায় ও পাল বংশ

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূ-স্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে উঠে। কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিলেন না। এ অরাজকতার সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘মাৎস্যন্যায়’ বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বলে ‘মাৎস্যন্যায়’। বাংলার সবল অধিপতিরা এমনি করে ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিল। এ অরাজকতার যুগ চলে একশত বছরব্যাপী। আট শতকের মাঝমাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে।

গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে বাংলায় পাল রাজত্বের সূচনা হয়। আর বাংলায় পাল বংশের রাজাগণ রাজত্ব করেন চারশত বছর। গোপালের ২৭ বছর রাজত্বের অবসানের পর ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দীর্ঘ ৪০ বৎসরের রাজত্বে তিনিই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ‘বিক্রমশীল বিহার’ এবং নাটোর জেলায় ‘সোমপুর বিহার’ প্রতিষ্ঠা করেন। চারশত বৎসরের পাল রাজত্বে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে একে একে দেবপাল, মহীপাল, রামপাল সফল শাসক হিসেবে রাজত্ব করেন। কিন্তু পরবর্তী শাসকগণ সিংহাসনে আরোহণ করলেও দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটান বিজয় সেন। বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেন বংশের শাসন।

সেন বংশ

সেন বংশের রাজত্বকাল তেরো শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বিজয় সেনের সুদীর্ঘকাল রাজত্বের পর সিংহাসনে বসেন তাঁরই পুত্র বল্লাল সেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত। তিনি দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দু’টি গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করে সমাজে তা পালনে বাধ্য করেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করে সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের প্রথম দিক ভালভাবে চললেও শেষ জীবন খুব সুখের ছিল না। তিনি শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। শেষ বয়সে তিনিও পিতার মত গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বসবাস শুরু করেন। তাঁর শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বখতিয়ার খলজি নদিয়া আক্রমণ করে খুব সহজেই তা দখল করে নেন। অবসান ঘটে সেন বংশের রাজত্বের।

মধ্যযুগের বাংলা (১২০৪ খ্রিঃ-১৭৫৭ খ্রিঃ)

বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনাকালকে বাংলায় মধ্যযুগের শুরু বলা হয়। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশবাসীর জীবনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বাংলায় মধ্যযুগের ইতিহাস ১২০৪ খ্রি. থেকে শুরু হয়ে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত বিস্তৃত।

মধ্যযুগের সূচনা

তেরো শতকের শুরুতে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন, যা মধ্যযুগের সূচনাকাল হিসেবে বিবেচিত। ইতিহাসে তিনি বখতিয়ার খলজি নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা না গেলেও তিনি ছিলেন খলজি বংশের একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক এবং জাতিতে তুর্কী।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির হাত ধরে বাংলায় মুসলমান শাসন সূচিত হয়ে বিভিন্ন শাসনকর্তা কর্তৃক প্রথম পর্যায় শাসিত হয় ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তাদের পুরোপুরি স্বাধীন বলা যাবে না। এঁদের কেউ ছিলেন বখতিয়ার খলজীর সহযোগী খলজী মালিক। আবার কেউ কেউ তুর্কী বংশের শাসক। শাসকদের সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। কিন্তু দিল্লির আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনের ইতিহাস

দিল্লীর সুলতানগণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুইশত বছর বাংলাকে তাঁদের অধিকারে রাখতে পারেননি। প্রথম দিকে দিল্লীর সুলতানের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। চেষ্টা করেছে বাংলাকে নিজের অধিকারে আনার জন্য। অবশেষে সফল হতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এ সময়ে বাইরের অন্য কোনো আক্রমণেরও তেমন সম্ভাবনা ছিলনা। তাই বাংলার সুলতানগণ স্বাধীনভাবে এবং নিশ্চিন্তে এদেশ শাসন করতে পেরেছেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের মাধ্যমে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের হাতে বাংলা প্রথম স্থিতিশীলতা লাভ করে। ১৩৩৮খ্রি. থেকে ১৫৩৮খ্রি. সময়কাল তাই স্বাধীন সুলতানী আমল হিসেবে পরিচিত।

আফগান শাসন ও বারভুঁইয়া (১৫৩৮ খ্রি: - ১৫৭৬ খ্রি:)

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান হলে একে একে বিদেশি শক্তিসমূহ গ্রাস করতে থাকে বাংলাকে। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন অল্প কিছুকাল বাংলার রাজধানীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আফগান নেতা শের শাহের কাছে পরাজয় মানতে হয়। বাংলা ও বিহার সরাসরি চলে আসে আফগানদের হাতে। আফগানদের দুই শাখা-শূর আফগান ও কররাণী আফগানরা বেশ কিছুকাল বাংলা শাসন করে। শেষ পর্যন্ত মুঘল সম্রাট আকবর আফগানদের হাত থেকে বাংলার ক্ষমতা কেড়ে নেন। আর আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৫৭৬খ্রি. মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়। রাজধানী দখল করলেও মুঘলরা বাংলার অভ্যন্তরে অনেকদিন পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। এ সময় বাংলায় অনেক বড় বড় স্বাধীন জমিদার ছিলেন। ‘বারভুঁইয়া’ নামে পরিচিত এ সমস্ত স্বাধীন জমিদার মুঘলদের অধিকার মেনে নেননি। সম্রাট আকবরের সময় মুঘল সুবাদারগণ ‘বার ভুঁইয়াদের’ দমন করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। ‘বার ভুঁইয়াদের’ দমন করা হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে।

মুঘল শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি:)

সুবাদারি ও নবাবি- এ দুই পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়। বার ভুঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো ‘সুবা’ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। সতের শতকের প্রথম দিক থেকে আঠার শতকের শুরু পর্যন্ত ছিল সুবাদারী শাসনের স্বর্ণযুগ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লীর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে মুঘল শাসন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। মুঘল আমলের এই যুগ ‘নবাবী আমল’ নামে পরিচিত। মুঘল সম্রাটের অনুমোদনে নয়, বাহুবলে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন আলীবর্দী খান। আলীবর্দীর শাসনকালে (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি:) বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আলীবর্দী খান তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন। অসহায়ভাবে পরাজয় ঘটে সিরাজউদ্দৌলার। এভাবেই পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর একই সাথে বাংলার মধ্য যুগেরও অবসান ঘটে।

মধ্যযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মধ্যযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে এ সময়ের শাসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ সময়ে বাংলার সমাজ জীবনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই প্রভাব বিদ্যমান ছিল বলা যায়। এ দুটো ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বাংলার সামাজিক রীতি-নীতি। এ সময়ে মুসলমান সমাজে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন এ তিন ধরনের শ্রেণির অস্তিত্ব যেমন বিদ্যমান ছিল তেমনি হিন্দু সমাজেও বর্ণ প্রথা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হতো। উভয় ধর্মাবলম্বীরা তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন।

মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক ও ব্যবসা বাণিজ্য সমাজ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি ছিল বাংলার কৃষি ও কৃষিজ উৎপাদন। বস্ত্র ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের অগ্রগতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতি কাপড়, মসলিন, রেশমী বস্ত্র, চাউল, চিনি, গুড়, আদা, লঙ্কা ইত্যাদি। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে চাউল, তামাক, সুপারি, পাট, ফল ইত্যাদি রপ্তানি হতো।

মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। এসব দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের মধ্যে প্রাসাদ ও মসজিদ উল্লেখযোগ্য। যেমন- সোনা মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ, লালবাগ দুর্গ, বড় কাটরা, ছোট কাটরা। মধ্যযুগে বিশেষ করে সুলতানী ও মুঘল শাসনকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে বহু আরবি ও ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। মুসলমান ও হিন্দু কবিদের কাব্যচর্চার নিদর্শন ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ জোলেখা’, জয়নুদ্দীনের ‘রসূল বিজয়’, কবি মোজাম্মেলের ‘সাতনামা’, ‘নীতিশাস্ত্রবর্তা’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুগে বিখ্যাত কবি লেখকগণের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের অমর রচনা ‘চৈতন্য-ভগবত’ এবং চন্দ্রাবতীর ‘মনসা মঙ্গল’ বাংলা ভাষার অনন্য নিদর্শন।

পলাশী যুদ্ধ ও বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা

১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলীবর্দী খান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি সফলভাবে রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি তাঁর সময়ে মারাঠা ও বর্গীদের দমন করে রাখতে সফল হন। সুকৌশলে ইংরেজ বণিক কোম্পানিকেও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার রাজনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নবাব মৃত্যুর আগে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ খ্রিঃ আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে নবাবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।



চিত্র: নবাব সিরাজউদ্দৌলা

সিংহাসনে বসার পর থেকে তাঁকে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। তাঁর প্রথম সমস্যা ছিল তাঁর পরিবারে ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে আলীবর্দী খানের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘাসেটি বেগম সিরাজের নবাব হওয়ায় আশাহত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এদের সঙ্গে যোগ দেন ঘাসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ। কৌশলে নবাব ঘাসেটি বেগমকে নজরবন্দী করেন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে সিরাজউদ্দৌলা এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করে নেন। নবাব পারিবারিক ষড়যন্ত্র কৌশলে দমন করলেও তাঁর বিরুদ্ধে বাইরে ষড়যন্ত্রের আরেক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত হয় দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজণ্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরো অনেকে। প্রত্যেকে যার যার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে থাকে। রবার্ট ক্লাইভও সন্ধিভঙ্গের অজুহাতে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭৫৭ খ্রি. ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আশ্রকাননে সংঘটিত হয় যুদ্ধ। নবাবের পক্ষে প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান দেশপ্রেমিক মীরমদন, মোহন লাল ও ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে। যুদ্ধে মীরমদন নিহত হন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফরের চরম অসহযোগিতা এবং মীর মদনের মৃত্যু নবাবকে বিচলিত করে। নবাবের সৈন্যরা যখন বিশ্রামরত ঠিক সে মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যরা নবাবের

সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার অনিবার্য পরিণতি নবাবের পরাজয়। এর মধ্য দিয়েই ভাগীরথীর তীরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়।

ইংরেজ শাসনামলে প্রতিরোধ ও স্বাধিকার আন্দোলন

বাঙালিরা কখনই বিদেশি ইংরেজ শাসকদের মেনে নেয়নি। ইংরেজ শাসনামলের আঠারো ও উনিশ শতক জুড়ে বাংলায় আর্থ-সামাজিক রাজনীতিতে বইতে থাকে পরিবর্তনের হাওয়া। এ পরিবর্তনের সূচনা করে বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষ। একদিকে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত, অন্যদিকে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি, কুসংস্কার দূর করে হিন্দু ধর্মেও সংস্কার এ দেশের সাধারণ মানুষকে জাগ্রত করতে থাকে, আর নিজেদের শিক্ষিত ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ব্রিটিশ বিরোধী এ প্রতিরোধ আন্দোলন নানাভাবে নানাজনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, নীল বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এসমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বাংলায় নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন বাংলার মানুষকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলায় এ গণজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিগণ হলেন- রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মহসীন, নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া। পরাধীনতার একশ বছর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে এদেশের সৈনিকরা ও দেশীয় রাজরাজরা। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ। বাঙালি তরুণ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দলে দলে আত্মাহুতি দিয়ে কাঁপিয়ে তোলে ইংরেজ শাসনের ভিত। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের।

সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৮৫৯খ্রি.)

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রায় ১০০ বছর পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে প্রথম এবং ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের সর্বাত্মক বিদ্রোহকে ব্রিটিশরা কেবল ‘সিপাহি বিদ্রোহ’ নাম দিয়ে এর তাৎপর্যকে খাটো করার চেষ্টা করলেও এটিই ছিল উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম। কোম্পানির দেশীয় সিপাহিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন স্থানীয় অনেক শাসক, জনগণ এবং ধর্মীয় নেতা। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক যৌথ নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ব্যারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। পরবর্তীতে মিরাত, দিল্লিসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত

হয়। সেই সময়ে সারা বাংলাদেশেও বেশ উত্তেজনা দেখা দেয়। রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, সিলেট ও যশোরে অনেকগুলো খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল উল্লেখযোগ্য। সিপাহি বিদ্রোহ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সিপাহি বিদ্রোহ ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ শাসন নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের ক্ষমতা



চিত্র: মঙ্গল পাণ্ডে

রহিত করে ব্রিটিশ সরকার ‘ভারত সরকার আইন ১৮৫৮’-এর অধীনে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্রোহের পরাজয় জাতীয়তাবাদী চেতনার অবসান ঘটায়নি, বরং ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বালাকোটের বিদ্রোহ এবং সিপাহি বিদ্রোহের মতো ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের প্রয়াসগুলোর ব্যর্থতা সনাতন কায়দায় যুদ্ধ করে যে মুক্ত হওয়া যাবে না, সে বোধই জাগিয়ে তোলে। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দু এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাঝে নতুন পর্যায়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, ভারতবাসীকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা-দর্শন ও বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করানোর নানান উদ্যোগ গড়ে ওঠে।

আলীগড় আন্দোলন (১৮৫৮-১৮৯৮ খ্রি.)

সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে ‘আলীগড় আন্দোলন’ শুরু হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ একজন আধুনিক চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসেবে তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের কারণে মুসলিম সমাজ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে টানাপোড়েন শুরু হয়, স্যার সৈয়দ আহমদ তা প্রশমিত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ শাসকদের তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের পশ্চাৎমুখিতা তাদেরকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অসহিষ্ণু করে তুলেছে। অন্যদিকে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানসিকতাকেও তাদের পশ্চাৎমুখী প্রবণতার জন্য দায়ী করেন। এসব কারণে স্যার সৈয়দ আহমদ অনুভব করেন যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি তৈরির জন্য ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার বিকল্প নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ‘আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে আধুনিকতাবাদী চিন্তাচেতনা বিস্তারে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে। পরবর্তীকালের মুসলিম লীগের মতো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল সূতিকাগার।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫

ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদ বিকাশে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫)-এর ভূমিকা অন্যতম। তিনি ১৮৭৬ সালে ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেন, যার চারটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : (১) দেশে একটি শক্তিশালী জনমতামত কমিটি/প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা; (২) ভারতীয় শ্রেণিগোষ্ঠীকে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উৎসাহ তৈরিতে একত্র করা; (৩) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি; (৪) জনগণভিত্তিক বৃহৎ আন্দোলন সংঘটিত করা (আহমেদ, ২০০০)। এ ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’-এর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, ১৯০৬ খ্রি.

১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর তৃতীয় আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি দল ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সিমলায় সাক্ষাৎ করেন এবং সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সাংবিধানিক সংস্কারে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। ভাইসরয় প্রতিনিধি দলকে নিশ্চয়তা দেন যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের দাবিকে

গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের প্রস্তাব করেন। সম্মেলনে সভাপতি নবাব ভিকার-উল-মুলকের সমর্থন লাভ করার মধ্য দিয়ে ঢাকার শাহবাগে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রধান উদ্দেশ্য

- ক) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও সরকারের সাথে উদ্ভূত ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা;
- খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং উন্নয়নের পথে ধাবিত করা;
- গ) ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সড়াব রক্ষা করা ও সম্প্রদায়গত ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০খ্রি.

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাংলা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলুল হক মুসলিমদের জন্য ভারতবর্ষে একাধিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন, যা ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।



চিত্র: শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

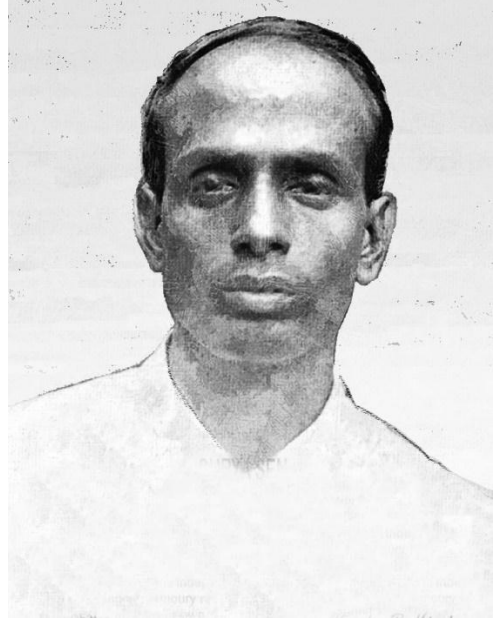
মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে ‘লাহোর প্রস্তাব’ গৃহীত হয় এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমি বা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

ভারত ভাগ ও ভারত-পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র, ১৯৪৭ খ্রি.

জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকলে একদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারত স্বাধীন করার নানান উদ্যোগ গৃহীত হয়, আরেকদিকে রাজনৈতিক সংগ্রামও শক্তিশালী হতে থাকে। মাস্টারদা সূর্য সেন ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেরসহ আরো অনেক বিপ্লবীর প্রাণদান যুব সমাজকে আলোড়িত করে। সুভাষচন্দ্র বসু দেশকে মুক্ত করতে ভারত থেকে পালিয়ে জার্মানি ও জাপান সফর করেন। অক্ষশক্তির হাতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ।



চিত্র: নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু



চিত্র: মাস্টারদা সূর্যসেন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় সত্ত্বেও এর পরপরই ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ এবং তার সমর্থনে সবগুলো নগরে লাখো লাখো মানুষের ঢল ব্রিটিশ শাসকদের আতঙ্কিত করে। হিন্দু-মুসলমানের মাঝে কৌশলে সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রেখে ব্রিটিশ শাসননীতি আর টিকবে না অনুমান করে ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর নিযুক্ত হবার পর ভারত ভাগের পরিকল্পনা করেন, যা ইতিহাসে ‘মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা’ হিসেবে পরিচিত।



চিত্র: লর্ড মাউন্টব্যাটেন

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘ভারতের স্বাধীনতা’ আইন পাস করা হয়। এ সময়ে ব্রিটিশরা আবারও কৌশলে নানান ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করে, স্থানীয়দের অনেকে তাদের স্বার্থে সুবিধাজনক কায়দায় ভারত বিভক্তিকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল। এরই জের ধরে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো মাঠে নামে, কলকাতাসহ ভারতের নগরগুলোতে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ নিহত হন। ভারত স্বাধীন আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমন্বয়ে ‘পাকিস্তান’ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর ১৫ আগস্ট ভারত নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’-এর ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তানের নব্য শাসনের বিমাতাসুলভ ভূমিকা বাংলার মানুষের মধ্যে নতুন করে গণজাগরণ সৃষ্টি করে এবং পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য নতুন করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়।

পাকিস্তান আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহ

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা পায়। ভৌগোলিকভাবে এর কাঠামো ছিল বিচ্ছিন্ন। এ রাষ্ট্রের দুই অংশের অবস্থানগত ব্যবধান যেমন ছিল প্রায় ১২০০ মাইলের (১৮০০ কিলোমিটারের অধিক) তেমনি এ দুই অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন সাদৃশ্য ছিল না। উভয় অংশের মধ্যে সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি ছিল ধর্ম। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি জনগোষ্ঠী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়। পাকিস্তানের অবাঙালি উচ্চশ্রেণি তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোকে প্রভাবিত করতে থাকে এবং বাঙালিদের ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে

নির্দয়ভাবে শোষণ করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সুপারিকল্পিতভাবে বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের ওপর আঘাত হানে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে চরম বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। যে স্বপ্ন নিয়ে পূর্ববঙ্গ ভারতবর্ষ হতে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সে স্বপ্ন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের নানা ষড়যন্ত্রের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তানি শাসকদের নিষ্পেষণ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দু পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। এ ভাষায় পাকিস্তানের মাত্র ৭.২% লোক কথা বলত। সাধারণত অধিকাংশ নাগরিকের মাতৃভাষাই যেকোনো স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু তা না করে পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। পূর্ব বাংলার জনগণ এর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

১৯৪৭ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে প্রথম উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সকল মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ‘রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস-আদালতের ভাষা করার দাবি ছিল এ সংগ্রাম পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সাথে বাংলা ও উর্দু দুটিকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও ছিল। পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে শহিদ) ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের (আইন সভা) প্রথম অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি পেশ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিম উদ্দিনসহ মুসলিম লীগ নেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ অন্যান্য কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ করে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানানো হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে চলতে

থাকে আরো অন্যান্য কর্মসূচি। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সচিবালয়ের সামনে পিকেটিং করার সময় পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানসহ ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করে।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসেন। ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, ‘উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনেও জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে রেসকোর্স ময়দানের প্রদত্ত বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা ‘না, না’ বলে জিন্নাহর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ঢাকায় অবস্থানকালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছাত্রদের সাথে ভাষা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি কোনো আপোস করতে রাজি হননি। ফলে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলন ধীরে ধীরে সারা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

একইভাবে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন। পূর্ব বাংলার জনগণ এর প্রতিবাদে প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে জাতীয় পরিষদে ভাষার প্রশ্ন বিষয়ে আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে নিহত হওয়ার পর খাজা নাজিম উদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনিও জিন্নাহর অনুসরণে ঘোষণা করেন উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। এ ঘোষণায় পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা চরম ক্ষুব্ধ হয় এবং শুরু হয় দেশব্যাপী হরতাল, ধর্মঘট ও ছাত্র বিক্ষোভ। ভাষা আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট ও রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার ডাক দেয়া হয়। সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচিতে সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। মিছিল ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, ফলে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। ২০ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই দিনে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’-এর বৈঠকেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোর হতেই ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জমা হতে থাকে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকাতে তারা মিছিল করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে (ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসংলগ্ন) অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন দেখে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্ররা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগানে প্রাদেশিক পরিষদের সভা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে উত্তেজনার একপর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের ওপর কাঁদানো গ্যাস ও

মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বার ও বরকত শহিদ হন। আহত হয়ে পরে শহিদ হন সালাম। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদদের গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এই জানাজায় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছাত্রজনতা মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণের চেষ্টা করে। এ মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে শফিউর রহমান শহিদ হন।



ছাত্ররা ঘটনাস্থলে ‘শহিদ মিনার’ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদদের স্মরণে প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়। এর গায়ে সাদা কাগজের ফলকে শহিদ ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ লেখা হয়। যা পরবর্তীকালে শহিদ মিনার নামে পরিচিতি লাভ করে। সাঈদ হায়দার ছিলেন প্রথম শহিদ মিনারের নকশাকার। শহিদ শফিউরের পিতা এ শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন। শুধু ঢাকা নয়, ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার সর্বত্র। পরবর্তীতে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশায় শহিদ মিনার বর্তমানের রূপ লাভ করে।



চিত্র: প্রথম শহিদ মিনার



চিত্র: বর্তমান শহিদ মিনার

এভাবে ছাত্র-জনতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। যার ফলে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি গণপরিষদে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত একুশের গান “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি” হয় বাঙালির শোক সংগীত ও প্রেরণার উৎস। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির ‘দ্বি-জাতিতত্ত্ব’-কে অসার প্রমাণ করে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্রমাগতভাবে বুঝতে পারে ধর্মের ভিত্তিতে যে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেই রাষ্ট্র আপামর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। বরং ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্মেষ ঘটে-যারা মূলত অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন এবং বাংলার জনগণের চূড়ান্ত মুক্তির জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শহিদ মিনার বাঙালির প্রেরণা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা মর্যাদার আসন লাভ করে।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে তাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃভাষাকে রক্ষা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ ঘোষণা করে। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের সিয়েরালিয়নে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণে পূর্ববঙ্গের জনমানুষের মনে বঞ্চনা, ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক, কারাবন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। পূর্ববঙ্গের আন্দোলন সংগ্রামের ঘটনা প্রবাহে এই দলের নামের পরিবর্তন হয়। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নতুন নামকরণ করা হয় ‘আওয়ামী লীগ’। এর মধ্য দিয়ে এ রাজনৈতিক দল প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলে পরিণত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, গণতন্ত্রী দল মিলে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল ‘নৌকা’, মুসলিম লীগের ‘হ্যারিকেন’। প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি যুক্তফ্রন্ট, মাত্র ১০ টি মুসলিম লীগ পায়। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে। মূলত এর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বদলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিজয় ঘটে। এ. কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যদিও অগণতান্ত্রিকভাবে মাত্র ৫৬ দিনের মধ্যে এ সরকারকে বরখাস্ত করে পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক শাসনকে অকার্যকর করে তোলে। তা সত্ত্বেও এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করে। মুসলিম লীগ নয়, যুক্তফ্রন্টই পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী-এ মনোভাব প্রতিষ্ঠা করে। যা পরবর্তী সময়ের আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

বাষট্টির গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান তার স্বনিযুক্ত একটি কমিটির মাধ্যমে ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি করেন। সংবিধানের যে অংশগুলো পছন্দমতো ছিল না তিনি সে অংশগুলো নিজের মতো করে পরিবর্তন করেন। এভাবে তার নির্দেশে রচিত সংবিধানটি ছিল তার স্বৈরশাসন পাকাপোক্ত করার একটি দলিল। মৌলিক গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত এ সংবিধানের মাধ্যমে তিনি তার স্বৈরশাসন আরো

পাকাপোক্ত করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ তা মেনে নেয়নি। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যরা আইয়ুব খানের সংবিধান ও মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তারা ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট’ নামে একটি বিরোধী জোট গঠন করেন। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শুরু হয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। আইয়ুব সরকার ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অনেককে গ্রেফতার করা হয়। সোহরাওয়ার্দীকে গৃহবন্দি করা হয়। ১৯৬৩ সালে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে দলকে নতুন রূপে বিন্যাস করেন।

ছাত্র আন্দোলন

পাকিস্তান সরকার বাঙালির ওপর বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক বিধান চালু করে। শিক্ষা সংকোচনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এ বছর ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন সংগঠন যোগ দেয়। দিন দিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সরকার শেষ পর্যন্ত শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট স্বীকৃত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। যদিও এরপরও ছাত্ররা ভোটাধিকার, সংবিধান বাতিলের জন্য দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র সমাজ ষাটের দশকে বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় যা মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ছয় দফা আন্দোলন

আওয়ামী লীগের ছয় দফা ছিল প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অন্যায় ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি দিয়ে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তীব্র প্রতিবাদ আর বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সনদ বা মুক্তির সনদ। নিচে ছয় দফার দাবিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশনরূপে (যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র) গড়ে তুলতে হবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে যেখানে সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।
২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধুমাত্র দুটি বিষয় থাকবে—প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়। অন্যান্য সকল বিষয়ে স্টেটসমূহের (প্রদেশসমূহ) পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।
৩. দেশের দুই অংশের জন্য দুটি পৃথক ও সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে; এবং মুদ্রার পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের ওপর। অথবা একই মুদ্রা থাকবে, তবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা

অন্য অঞ্চলে সহজে পাচার না হতে পারে সেজন্য একটি ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই অঞ্চলের মধ্যে দুটি আলাদা আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. প্রাদেশিক সরকার রাজস্বনীতি প্রণয়ন, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা পাবে। তবে দেশরক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যয় বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করবে।
৫. দুই প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখতে হবে এবং অর্থের ওপর স্ব স্ব আঞ্চলিক সরকারের এখতিয়ার থাকবে। সংবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে মুদ্রা সরবরাহ করবে।
৬. প্রদেশগুলোকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। (উৎস : বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধের দলিলপত্র, (২য় খণ্ড), হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃ. ২৫৯)।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নিকট ‘ম্যাগনাকাটা’ বা মুক্তির সনদ রূপে পরিগণিত হয়। ছয় দফার অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রথমত পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা; দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। ছয় দফার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী একই ছাতার তলে সমবেত হয় এবং আন্দোলনের নতুন দিশা পায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রচিত হয় এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ৬ দফার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সাফল্য লাভ করে।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

ছয় দফা কর্মসূচির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগোষ্ঠী সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা বিভিন্ন দমন-নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়। ছয় দফার আন্দোলনকে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল বলে বিবেচনা করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে আরো ৩৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিস ও সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য’ নামক একটি মামলা দায়ের করে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রমূলক এই রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলার সামরিক আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। শেখ মুজিবসহ ষড়যন্ত্রমূলক এই মিথ্যা মামলার বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৩৪ জন বাঙালি

অফিসারকে দেশের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়াই ছিল এ মামলার অন্যতম উদ্দেশ্য। সরকারের হয়রানি ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। একই সময়ে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে কারাবন্দি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক পাকিস্তানি সেনাদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন এবং পরবর্তীতে সার্জেন্ট জহুরুল হক হাসপাতালে শাহাদৎ বরণ করেন। ফলে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয় (খান, ১৯৯৬)।

এগারো দফা আন্দোলন

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের যে কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে প্রণীত এগারো দফার মধ্যে তাদের সমন্বিত কর্মকৌশল ও নীতির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে গঠিত ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ (Student Action Committee-SAC) আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে (খান, ১৯৯৬)। এ ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারি এগারো দফার কর্মসূচি ঘোষণা করে, যেখানে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এগারো দফার মূল বক্তব্য ছিল—

১. শিক্ষার সমস্যাবলির আশু সমাধান এবং ব্যাপক প্রসার ঘটানো
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
৩. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন
৪. পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও তাদেরকে ফেডারেল সরকারের অধীনে আনা
৫. ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ
৬. কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করা
৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস নিশ্চিত করা
৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার;

৯. নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার;

১০. সিয়াটো, সেনটো ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ এবং

১১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামিসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি প্রদান।

এগারো দফাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়। ফলে পুলিশি নির্যাতন ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ক্রমান্বয়ে ছাত্র আন্দোলন একটি গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এগারো দফা আন্দোলন দ্রুত পট পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে ধারাবাহিক ঘটনাবলি আন্দোলনকে একটি গণঅভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত করে। সকল সরকারি অফিস ও রাজপথ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং প্রাদেশিক সরকার অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৬৯খ্রি.

ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ায় ‘কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ এগারো দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২৪ জানুয়ারিকে ‘গণঅভ্যুত্থান দিবস’ ঘোষণা করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে সামরিক হাজতে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সামরিক অফিসারের গুলিতে নিহত হন। এ সমস্ত ঘটনা চলমান আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। আন্দোলনকে দমানোর লক্ষ্যে সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান সেনাবাহিনীকে তলব করেন। কিন্তু জনগণের দুর্বীর আন্দোলন শাসকগোষ্ঠীর হুমকির মুখে দমে যায়নি। বরং চারিদিকে ‘জয় বাংলা’, ‘তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা’, ‘আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ’ ইত্যাদি স্লোগানে আন্দোলন মুখরিত হয়ে ওঠে। এসব স্লোগান মূলত একটি ভাষাভিত্তিক ও জাতিভিত্তিক আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। আন্দোলন ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করার কৌশল নিলেও পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে গণদাবির কাছে নতি স্বীকার করে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়—প্রথমত পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ড. এম.এন. হুদাকে নিয়োগ; দ্বিতীয়ত শীঘ্রই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের ঘোষণা; তৃতীয়ত পরবর্তী নির্বাচনে জেনারেল আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়া এবং সর্বশেষ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক শেখ মুজিবসহ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামিকে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণসংবর্ধনা দেয়া হয় এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ খেতাবে ভূষিত করা হয় (খান, ১৯৯৬)।

তীব্র ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে রাজনৈতিক দলগুলোর গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘ছয় দফা’ ও ‘এগারো দফা’র ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে গণআন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে। তিনি তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর দশ বছরের একনায়কত্বের অবসান হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচন

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক আইনের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে পাকিস্তানের ৩১৩ আসনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি বিজয় লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে প্রাদেশিক পরিষদেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% ও প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়। এ নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল ও বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে অভ্যুদয়ের আবহ সৃষ্টি করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে মার্চ মাস ছিল অত্যন্ত ঘটনাবল্ল একটি মাস। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। তার পূর্বে তিনি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক করে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করেন। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো সরকারের এ উদ্যোগ না মেনে ষড়যন্ত্রের নতুন খেলায় মেতে ওঠেন। তিনি ঢাকায় আসতে এবং ৩ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে যোগদান করে ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন।

এ ঘোষণা জনগণের চলমান আন্দোলনকে গণবিস্ফোরণের দিকে ঠেলে দেয়। সমগ্র দেশের জনগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান। অতঃপর তিনি একে একে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। এছাড়া তিনি ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। পাকিস্তানের সামরিক জাঙ্গা হরতাল বানচাল করার লক্ষ্যে ঢাকায় কারফিউ জারি করে কিন্তু স্বাধীনতার নেশায় বিস্ফোরোনুখ জনগণের আন্দোলন তা এতটুকু স্তিমিত করতে পারেনি। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের এক বিশাল ছাত্রসভায় বাংলাদেশ স্বাধীন করার শপথ গ্রহণ করা হয় এবং সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ, ১৯৭১ রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।



চিত্র: বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ৭ মার্চের (১৯৭১) জনসভা এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। যেকোনো বিচারেই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর রাজনৈতিক বক্তৃতায় অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি ইউনেস্কোর ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ’ (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশ তখন এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। ইতোমধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রকাশ্যে স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছে এবং জনগণও মানসিকভাবে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তখন সকলের দৃষ্টি বঙ্গবন্ধুর দিকে—তিনি কী বলেন। ৭ মার্চ রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐদিন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সারা দেশে অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। এ বক্তৃতায় বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। স্বাধীনতার কৌশলী ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তাই ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

অন্যদিকে ১০ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সংকট ও অচলাবস্থা নিরসনের জন্য ঢাকায় নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু হত্যাজ্ঞার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।

১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসন চালু করার জন্য ৩৫টি বিধি জারি করেন। কার্যত দেশ পরিচালিত হতে থাকে উল্লিখিত বিধি দ্বারা। এ দিনই ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন এবং আলোচনার নামে ১০ দিন সময় অতিবাহিত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রে যুক্ত হন জুলফিকার আলী ভুট্টো। আলোচনার নামে প্রহসনের মাধ্যমে মূলত সামরিক বাহিনীকে সর্বাঙ্গিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলীর এই অসৎ উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধু ও জনগণ বুঝতে পারেন। আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং ইয়াহিয়া ২৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

পাকিস্তান বাহিনীর হামলা ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর নেমে আসে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। ‘অপারেশন সার্চ লাইট’-এর নামে ২৫ মার্চের মধ্যরাতে হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিরীহ-নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্যাংক, ভারী কামান ও নানাবিধ অস্ত্র-সস্ত্র সহকারে নিষ্ঠুর হত্যায়জ্ঞে মেতে ওঠে।



চিত্র: ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর নির্মম হত্যায়জ্ঞ

তারা প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, পুলিশ ও ই.পি.আর. ব্যারাকে আক্রমণ চালায়। এছাড়া হলসংলগ্ন শিক্ষকদের বাসগৃহে, কর্মচারীদের বাসস্থানে, বিভিন্ন দলীয় কার্যালয়ে বর্বরোচিত হামলা চালায়। হত্যা করে ছাত্র, শিক্ষক, শিশু, পুলিশসহ অসংখ্য মানুষকে। অন্যান্য স্থানেও তারা নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়।

বাড়িঘর, দোকানপাট, সংবাদপত্র অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয় ও লুটপাট করে। বিদেশে সংবাদ প্রেরণের ওপর কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এক রাতের মধ্যে তারা ঢাকা শহরকে বধ্যভূমি ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ জন্য গণহত্যা শুরু ২৫ মার্চের রাতকে বলা হয় কালরাত।

২৫ মার্চ রাত হতেই মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। এদিনই পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের মুখে পিলখানায় ইপিআর বাহিনী ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শহরের নানা স্থানে মানুষ রাস্তার ওপর ব্যারিকেড দেয়। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের সশস্ত্র প্রবল আক্রমণের মুখে এ প্রতিরোধ দীর্ঘ হয়নি। ২৫ মার্চের গভীর রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গ্রেফতার করে ও পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এজন্যই ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে আন্তর্জাতিক মহল ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। ঘোষণাটি নিম্নরূপ:

“This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.” (সূত্র: BANGLAPEDIA, Asiatic Society of Bangladesh)

স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ : “ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও” (সূত্র: বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ৩, ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১৫৩)।

তিনি পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের আগ পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর এ নির্দেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান ও অন্যান্য ব্যক্তি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান একই বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। (উৎস : এম. আর. আখতার মুকুল সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, এক খন্ডে সংক্ষেপিত, ১৯৮৮, পৃ. ১৪১)।

মুজিবনগর সরকার গঠন (বাংলাদেশ সরকার), ১৯৭১

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার (তৎকালীন কুষ্টিয়া) বৈদ্যনাথতলার আম বাগানে (বর্তমানে মুজিবনগর) অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ সরকার ‘মুজিবনগর সরকার’ নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম- উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমেদ-প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এম. মনসুর আলী-অর্থমন্ত্রী এবং এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান-স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তান কারাগারে বন্দি। ফলে তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।



চিত্র: বৈদ্যনাথতলায় জনসমাবেশে ভাষণদানরত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

অস্থায়ী সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাক-সাংবিধানিক দলিল হিসেবে বিবেচিত। এ সনদে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতা কার্যকরের কথা উল্লেখ করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর ভূমিকা

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এর বাঙালি সদস্য, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দলে দলে মানুষ ভারতে গিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। অনেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এভাবেই প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধে সামরিক-বেসামরিক নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছে। এদের সমন্বয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বেশ কিছু বাহিনী যেমন-নিয়মিত সেনা ব্যাটেলিয়ন, সেক্টর ট্রুপস, গণবাহিনী, বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল। তারা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযুদ্ধ কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও বিভিন্ন সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। গঠন করা হয় তিনটি ব্রিগেড ফোর্স। এগুলো হলো ‘জেড ফোর্স’, ‘এস ফোর্স’ এবং ‘কে ফোর্স’। মেজর জিয়াউর রহমান ‘জেড ফোর্স’, মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ ‘এস ফোর্স’ এবং মেজর খালেদ মোশাররফ ‘কে ফোর্স’এর অধিনায়ক ছিলেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বি. এল. এফ. গঠিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত পূর্ব বাংলার অফিসার, সৈনিক, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ এসব বাহিনীর গঠন ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধারা এতে অংশগ্রহণ করে। এরা সকলে মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিত।

দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা নিজ নিজ উদ্যোগে বেশ কিছু বাহিনী গড়ে তোলেন। ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে তারাও দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী স্থল, জল ও আকাশ পথে আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এছাড়া গ্রাম ও শহরের অনেকে এককভাবে কমিটি গঠন করে মুক্তিবাহিনীর থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ও যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করেন।

মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর বিশেষ অবদান ছিল। তারা গোপনে ও আকস্মিকভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। তারা পূর্ব পরিকল্পনামতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অতর্কিত আক্রমণের পর নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করতেন। অনেক সময় সম্মুখ যুদ্ধেও তারা বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ শেষের দিকে প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে তাদের আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। দেশের ভিতরে ও বাহিরে গড়ে ওঠা অন্যান্য বাহিনীও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।



চিত্র: যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা

দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য অকৃত্রিম দেশপ্রেমের নজির রেখেছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী ছাড়া দেশপ্রেমিক সকল মানুষ ছিলেন তখন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি জনপদে মুক্তিকামী নিঃস্বার্থ সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। অনেকে শহিদ হয়েছেন, অনেকে পঙ্গু হয়েছেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখনো বেঁচে আছেন। আমরা সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রদান করে। এছাড়া ন্যাপ (মোজাফ্ফর), ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি সংগঠন এবং সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, শ্রমিকসহ নানা পেশার মানুষও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করেছিল জামায়াতে ইসলাম, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, ইসলামি ছাত্র সংঘ ইত্যাদি সংগঠন। তাছাড়া তারা আল-বদর

বাহিনী ও আল-শামস বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করে এবং মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। সে দেশের সরকার ও জনগণ তাদের থাকার ব্যবস্থা করে। ভরণপোষণসহ ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, একপর্যায়ে সামরিক শক্তি দিয়েও সহযোগিতা করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী নিয়ে যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। পরের দিন ৭ ডিসেম্বর (১৯৭১) প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ নতুন মাত্রা পায়। বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ কমান্ড পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর শানিত আক্রমণ পরিচালনা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তিসমূহ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের শোষিত মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়ালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। বিশেষ করে ভারত অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতা দেয়। বাংলাদেশ সরকার গঠন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ দিয়ে ভারত বিভিন্নভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। ‘অপারেশন সার্চ লাইট’এর নামে পাকিস্তানি বাহিনী ২৫ মার্চ কালোরাতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর যে নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত করেছিল জাতিসংঘ তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে।

চূড়ান্ত বিজয়

যৌথ কমান্ডের সুপরিকল্পিত ও প্রচণ্ড আক্রমণে ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম যশোর সেনানিবাসের পতন হয়। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মুক্ত হতে থাকে। সাতক্ষীরা মুক্ত করে যৌথ বাহিনী খুলনা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। অন্যদিকে যৌথ বাহিনীর অন্য একটি দল ঢাকার পাশের জেলাসমূহ বিশেষ করে জামালপুর, টঙ্গী, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ ও কুমিল্লা সেনানিবাসের পতন ঘটিয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি সেই মুহূর্তে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসের সহযোগিতায় ইতিহাসের নিকৃষ্টতম হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার খোরাকদাতা ও জাতির বিবেক বুদ্ধিজীবীদের (শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী প্রভৃতি) হত্যা করা হয়। ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর এই বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসসহ এ দেশীয় দালালেরা এ হত্যাযজ্ঞ চালায়। পরে ঢাকার মিরপুর ও

রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে তাঁদের অনেকের বিকৃত লাশ পাওয়া যায়। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করা হয়। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ১২ ডিসেম্বর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবের ওপর চার দিন যাবৎ সংঘটিত আলোচনায় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রস্তাবনা চূড়ান্ত হলেও যৌথ বাহিনী ১৪ ডিসেম্বর ঢাকাকে প্রায় ঘিরে ফেলে। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানের সেনানায়ক জেনারেল নিয়াজী প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্য ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদসহ রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।



চিত্র: পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ



চিত্র: পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর

পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’।

জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রই এ নতুন রাষ্ট্রকে জন্মের কয়েক মাসের মধ্যে স্বীকৃতি প্রদান করে।

পৃথিবীর বুকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে নতুন এ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে অনেক রক্তের বিনিময়ে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা এ দেশের মানুষকে হত্যাসহ নানাভাবে নিপীড়ন করেছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিরীহ বাঙালিকে ক্যাম্পে ধরে এনে করেছে অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যা। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এ যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছে। প্রায় ৪ লক্ষ নারী পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা পঙ্গুত্ব বরণ করেন। প্রায় ১ কোটি বাঙালি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করেছে। এভাবে অগণিত ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। প্রবাসে অবস্থানরত বাঙালিরা যুদ্ধে বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। বিশ্বের বিভিন্ন

দেশের গণতান্ত্রিক মানুষ পাকিস্তানি গোষ্ঠীর এরূপ নির্মম ও ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য

যে জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে তার ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটো রাষ্ট্রের জন্ম যে চূড়ান্তভাবে ভুল ছিল সেটা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী না বুঝলেও বাঙালি জাতি তার সংগ্রামী মনোভাব ও চেতনা দ্বারা বিশ্ববাসীকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে থাকার অর্থ হলো একটি জাতিগোষ্ঠীর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়া। ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার চূড়ান্ত ও ন্যায়সঙ্গত পরিসমাপ্তি হয়েছিল ‘বাংলাদেশ’ নামক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে।

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধি

বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কতকগুলো বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদান করেছে। যেমন—

১. **বীরশ্রেষ্ঠ** : এটি সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি। মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের মাঝে সাতজনকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এ খেতাবে ভূষিতরা হলেন—বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ, বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন এবং বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।



মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর



হানিদুর রহমান



মোহাম্মদ মোহাম্মদ কামাল



মোহাম্মদ রহমান আমিন



মতিউর রহমান



মুসি আব্দুর রউফ



নূর মোহাম্মদ শেখ

২. বীরউত্তম : মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য প্রদত্ত এটি দ্বিতীয় বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি। ৬৮ জন এ উপাধি লাভ করেন।
৩. বীরবিক্রম : মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য দেয়া এটি তৃতীয় বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি। ১৭৫ জন এ উপাধি লাভ করেন।
৪. বীরপ্রতীক : মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য এটি চতুর্থ বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি। ৪২৬ জন এ উপাধি লাভ করেন।

জাতীয় অর্জন

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ডই অর্জন করেনি, বরং অর্জন করেছে আরো অনেক কিছু। আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশের নতুন পতাকা, বাংলা ভাষায় কথা বলা, লেখার অধিকার, একটি সংবিধান, জাতীয় সংগীত, জাতীয় প্রতীকসমূহ, জাতীয় মনোগ্রাম, স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবস। আমাদের ভাষা বিশ্বের দরবারে পেয়েছে যথাযথ মর্যাদা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এ সব কিছু আমাদের এনে দিয়েছে জাতীয় মুক্তি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সম্মান। এর ফলেই বিশ্বের বুকে ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্র ক্রমাগত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা এসব কিছু অর্জন করেছি তাঁদের আমরা সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাব।

আমাদের জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫ খ্রি.)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বাংলাদেশের, বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সাহেরা খাতুন। ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি.এ পাশ করেন। এই সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হলেও তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাদের বিক্ষোভ করার পরামর্শ দেয়ার অভিযোগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।



১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে প্রধান সংগঠকদের একজন ছিলেন শেখ মুজিব। বঙ্গত জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের (১৯৪৯) যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হন।

১৯৪৮ সালে যখন ভাষা আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই শেখ মুজিব এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার অধিকার দাবি করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

‘আমরা এখানে বাংলায় কথা বলতে চাই। আমরা অন্য কোনো ভাষা জানি কি জানি না তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি মনে হয় আমরা বাংলাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা সত্ত্বেও আমরা সবসময় বাংলাতেই কথা বলব। যদি বাংলায় কথা বলতে দেওয়া না হয় তাহলে আমরা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাবো। কিন্তু পরিষদে বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। এটাই আমাদের দাবি।’

বিশ শতকের ষাটের দশকের প্রথমদিকে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে প্রাধান্য লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং এই ছয় দফাকে আখ্যায়িত করেন ‘আমাদের (বাঙালিদের) মুক্তি সনদ’ রূপে। প্রকৃতপক্ষে ছয়-দফা কর্মসূচীর অর্থ ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা। সকল রাজনৈতিক দলের রক্ষণশীল সদস্যরা এ কর্মসূচীকে আতঙ্কের চোখে দেখলেও এটা তরুণ প্রজন্ম বিশেষত ছাত্র, যুবক এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নূতন জাগরণের সৃষ্টি করে। মুজিব কর্তৃক ছয়দফা কর্মসূচীর ঘোষণা দেওয়ার পর আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে ও তাঁকে কারারুদ্ধ করে। এ মামলার বিচারের সময় সমগ্র জাতি তাদের নেতার বিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে আইয়ুব সরকার অবস্থা শান্ত করতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। শেখ মুজিবের মুক্তির পর সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এক গণসম্মেলনের আয়োজন করে, পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ এ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ নামে আখ্যায়িত করেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সাতটি আসন সহ) জয়লাভ করে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের বিশাল জমায়েতে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। মুজিব তাঁর ভাষণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্যর্থ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ আনেন। বক্তৃতার শেষে মুজিব ঘোষণা করেন : ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাহ আল্লাহ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন এবং লাগাতার হরতাল চলছিল। মার্চে ২ তারিখ থেকে ছাত্র এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন এবং এ ধারা অব্যাহতভাবে চলে। এ

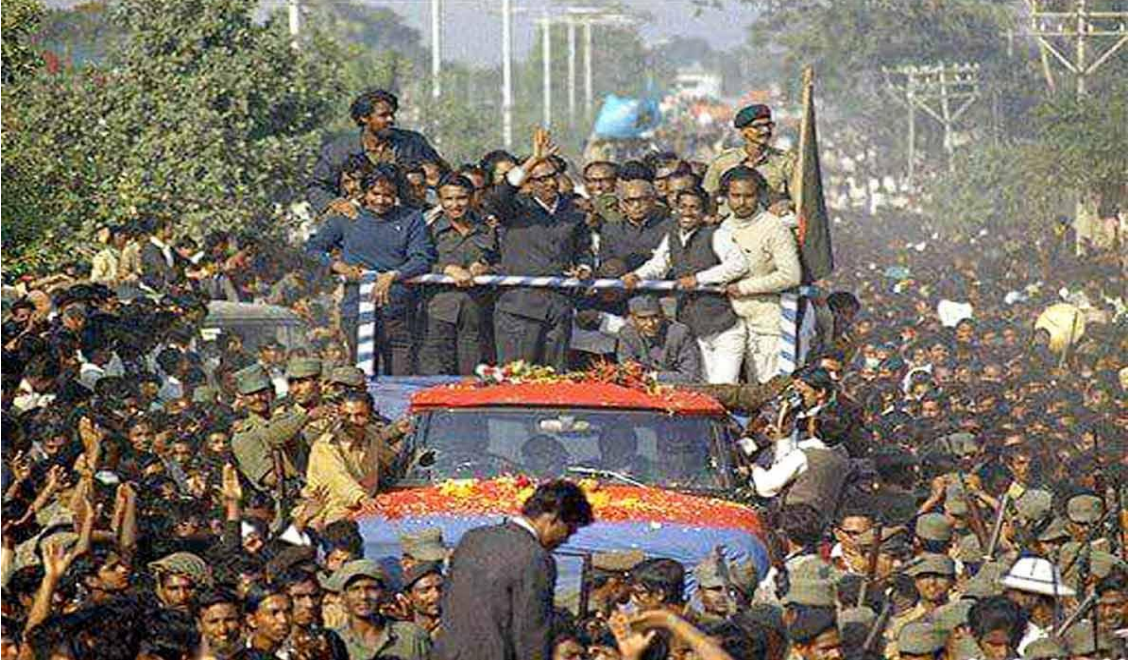
পটভূমিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্থানে পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক এবং নিরীহ লোকদের গণহত্যা করে। এভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী দীর্ঘ নয় মাস ধরে গণহত্যা চালিয়ে যায়। শেখ মুজিবকে ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগে বিচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।



চিত্র: আটক অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা সম্প্রচারের জন্য ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এক ওয়্যারলেস বার্তা পাঠান।

২৫ মার্চ পাক বাহিনীর হামলার পর থেকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়, বঙ্গবন্ধু যদিও সে সময় পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী ছিলেন তথাপি তাঁকে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময় শেখ মুজিবের অনন্য সাধারণ ভাবমূর্তি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা এবং জাতীয় ঐক্য ও শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদারী থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি কারাগার হতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি লন্ডন হয়ে বিজয়ীর বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।



চিত্র: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

সারা দেশে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যায়। সমাজের সবস্তরের লাখে জনতা তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়।

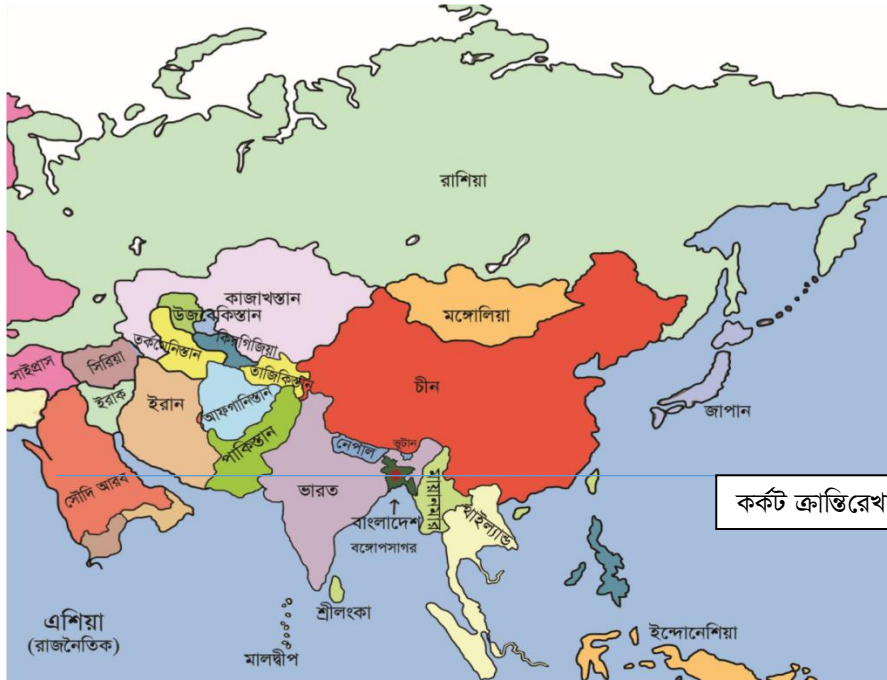
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে তিন বছর নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। শূন্য থেকে শুরু করে তাঁর সরকারকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের অগণিত সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনাসদস্য তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের অন্য যেসব সদস্য তাঁর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তাঁদের সবাইকে হত্যা করে। এ ঘৃণ্য শোক গাঁথা ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতির ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অধ্যায় ৭

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ

বাংলাদেশের অবস্থান, আয়তন ও সীমানা

মানুষ ও তার পরিবেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করে, অর্থাৎ মাথার ওপরের নীল আকাশ, বিস্তীর্ণ ভূমি, বিশাল সমুদ্র-নদী, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক ও মানবীয় পরিবেশ একত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ গড়ে তোলে। স্থানভেদে ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের সাথে সাথে সেখানকার মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক কার্যাবলির পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন-কোনো স্থান কৃষিকাজে, মৎস্য চাষে, পশু পালনে অথবা শিল্পে উন্নত হওয়ার পিছনে সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। অঞ্চলভেদে পরিবেশের বিভিন্নতার প্রভাবেই মানুষের খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, জীবনযাত্রা প্রভৃতিরও বিভিন্নতা হয়ে থাকে। উর্বর পলিমাটির বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। অন্যদিকে সাগর সান্নিধ্যে থাকা জাপান, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ মৎস্য শিল্পের জন্য বিখ্যাত। প্রচুর খনিজ সম্পদ বা শিল্পের কাঁচামালের সরবরাহ থাকাই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মান, জাপান প্রভৃতি দেশ শিল্পে উন্নত। শুধু তাই নয়, কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর সে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ নির্ভরশীল। বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার। নিচে এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হলো।



এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। উপরের মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান লক্ষ করলে দেখা যায় বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের তীরে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান প্রায় $20^{\circ}38'$ উত্তর অক্ষাংশ থেকে $26^{\circ}38'$ উত্তর অক্ষাংশ এবং $88^{\circ}01'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে প্রায় $92^{\circ}45'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের প্রায় মাঝামাঝি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। চমৎকার

একটি ভৌগলিক অবস্থানে অবস্থিত হওয়ায় দেশটির জলবায়ুও মনোরম, বহু নদী এদেশটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মেশার আগে তার পলিমাটি দিয়ে এ অঞ্চলকে করেছে সমৃদ্ধ। একদিকে হিমালয় যেমন প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে দেশটিকে হিমশীতলতা থেকে রক্ষা করেছে অন্যদিকে প্রচণ্ড গরমে বঙ্গোপসাগরের বাতাস দেশটিকে করেছে শীতল, আর বর্ষাবিশ্বের সাথে যোগাযোগের দ্বারও দিচ্ছে খুলে।

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাংলাদেশ তিন দিকেই ভারত ও দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্ব দিকে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিয়ানমার, পশ্চিম দিকে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। নদী ও বনাঞ্চল বাদ দিয়ে বাংলাদেশের আয়তন ১,১৬, ৫০৮ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে বিশাল এলাকা ক্রমান্বয়ে জেগে উঠছে। ভবিষ্যতে এর প্রসার ঘটলে বাংলাদেশের আয়তন আরো বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগ

রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, এটি বাংলাদেশের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত। এটি প্রায় ৪০০ বছরের একটি পুরাতন শহর। শহরটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ঢাকার লোকসংখ্যা প্রায় ১৬.৬ মিলিয়ন। বাংলাদেশের সরকার ও জনপ্রশাসনের সকল প্রধান কার্যালয় রাজধানী শহরে অবস্থিত।

বিভাগ

দেশ পরিচালনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে আটটি বিভাগীয় শহরে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগগুলো হলো-ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, রংপুর বিভাগ, সিলেট বিভাগ ও ময়মনসিংহ বিভাগ। আয়তনে সবচেয়ে বড় চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সবচেয়ে ছোট সিলেট বিভাগ। প্রতিটি বিভাগে একটি করে বিভাগীয় শহর আছে, এ শহরগুলোর নাম অনুযায়ী বিভাগগুলোর নামকরণ হয়েছে।

ঢাকা বিভাগ

সীমানা: উত্তরে ময়মনসিংহ, দক্ষিণে বাগের হাট, পিরোজপুর, বরিশাল ও চাঁদপুর; পূর্বে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা; পশ্চিমে নড়াইল, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ।

আয়তন : ৩১০৫১ বর্গ কিঃ মিঃ, লোকসংখ্যা : ৪,৬৭,২৯,০০০ , জেলার সংখ্যা : ১৩ টি, উপজেলার সংখ্যা : ১২৩টি, সংসদীয় আসন: ৭০ টি।

চট্টগ্রাম বিভাগ

পাহাড় সমুদ্র নদী সমতল বেষ্টিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র উপকূলের অনুপম সৌন্দর্যের আধার চট্টগ্রাম বিভাগ। বিভাগের দক্ষিণে দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মানচিত্রে পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থান।

সীমানা: উত্তরে ভারতের আগরতলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণপূর্বে মায়ানমার, পূর্বে ভারতের মিজোরাম, পশ্চিমে ভোলা জেলা, শরীয়তপুর জেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলা, নরসিংদী জেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা, হবিগঞ্জ জেলা।

আয়তন : ৩৩,৯০৪ বর্গ কিঃ মিঃ, লোকসংখ্যা : ২,৯১,৪৫,০০০ (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী), জেলার সংখ্যা : ১১টি, উপজেলার সংখ্যা : ১০৩টি, সংসদীয় আসন: ৫৮টি

খুলনা বিভাগ

সীমানা: খুলনা বিভাগ এর উত্তরে রাজশাহী, নাটোর, পাবনা জেলা, দক্ষিণে বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত সুন্দরবন সহ বঙ্গোপসাগরের উপর তটরেখা; পূর্বে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, পিরোজপুর, বরগুনা জেলা, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা।

আয়তন : ২২,২৮৫ বর্গ কিঃ মিঃ , লোকসংখ্যা : ১৫,৫৬৩,০০০ (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী), জেলার সংখ্যা : ১০টি, উপজেলার সংখ্যা : ৫৯টি, সংসদীয় আসন: ৩৬টি

সিলেট বিভাগ

সিলেট বিভাগের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে উঁচু উঁচু পর্বত শ্রেণীর পাহাড়ী অঞ্চল। মূলত: মেঘালয়, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরার পাহাড়ের মাঝামাঝি বিস্তৃত এলাকাটিই হচ্ছে সিলেট বিভাগ বা প্রাচীন শ্রীহট্ট। অভ্যন্তরীণ সীমানাভূমি বেশির ভাগ সমতল প্রান্তর। স্থানে স্থানে জঙ্গল ও বালুকাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা রয়েছে।

সীমানা : উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা।

আয়তন : ১২,৫৫৮ বর্গ কিঃ মিঃ জনসংখ্যা : ৯৮,০৭,০০০ (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী), জেলার সংখ্যা : ৪টি, উপজেলার সংখ্যা: সংসদীয় আসন: ১৯ টি

রাজশাহী বিভাগ

সীমানা: উত্তরে গাইবান্ধা জেলা, দিনাজপুর জেলা ও পশ্চিমবঙ্গ(ভারত), দক্ষিণে কুষ্টিয়া জেলা ও রাজবাড়ি জেলা, পূর্বে জামালপুর জেলা, টাঙ্গাইল জেলা, মানিকগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)।

আয়তন: ১৮১৫৪ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা: ১,৮৪,৮৫,০০০, জেলার সংখ্যা: ৮টি , উপজেলা: ৬৭টি, সংসদীয় আসন সংখ্যা: ৩৯টি

রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

সীমানা: উত্তরে ভারতের কুচবিহার ও শিলিগুড়ি, দক্ষিণে জয়পুরহাট জেলা ও বগুড়া জেলা, পূর্বে ভারতের আসাম ও মেঘালয়, পশ্চিমে বিহার।

আয়তন: ১৬৩৪.৩৭ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা: ১,৫৫,৩৭,৬৭৬, জেলার সংখ্যা: ৮টি, উপজেলা: ৫৮টি, সংসদীয় আসন সংখ্যা: ৩৯ টি

বরিশাল বিভাগ

সীমানা: উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলা, মাদারীপুর জেলা, শরীয়তপুর জেলা, চাঁদপুর জেলা, দক্ষিণে বিজ্ঞত বঙ্গোপসাগর, পূর্বে লক্ষ্মীপুর জেলা, পশ্চিমে বাগেরহাট জেলা ।

আয়তন: ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা: ৮১,৭৩,৭১৮, জেলার সংখ্যা: ৬টি, উপজেলা: ৪১টি, সংসদীয় আসন সংখ্যা: ২১টি

ময়মনসিংহ বিভাগ

সীমানা: উত্তরে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলা, গাজীপুর জেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে গাইবান্ধা জেলা, বগুড়া জেলা ও সিরাজগঞ্জ জেলা ।

আয়তন: ১০,৪৮৫ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা: ১,১৩,৭০,০০০, জেলার সংখ্যা: ৪টি, উপজেলা: ৩৫টি, সংসদীয় আসন সংখ্যা: ২৪টি

ভূ-প্রকৃতি

কোনো স্থানের ভূমির রূপ বা অবস্থাকে সে স্থানের ভূ-প্রকৃতি বলা হয়। আমাদের প্রত্যেকের তার এলাকা বা অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি যেমন জানা প্রয়োজন, তেমনি নিজ দেশ অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কেও সকলের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়া দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি। এ দেশের ওপর দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান নদী হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলী প্রভৃতি। এসব নদ-নদী এবং এর উপনদী ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। সাগরে মিশে যাওয়ার আগে এসব নদী তার পলি দিয়ে এ অঞ্চলকে পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ হিসাবে গড়ে তুলেছে।

ভূমির অবস্থা ও গঠন সময়ানুক্রমিক হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিরূপকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-(১) পাহাড়ি অঞ্চল (২) পুরাতন পলল গঠিত সমভূমি অঞ্চল ও (৩) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল।

পাহাড়ি অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চল। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকাগুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। সম্ভবত টারশিয়ারি যুগে (২.৫মিলিয়ন বছর আগে) হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির সময়ে মিয়ানমারের দিক থেকে আসা ধাক্কায় ভাঁজগ্রস্ত হয়ে এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর সৃষ্টি হয়েছে। তাই এদের টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বলা হয়। এ পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধারণা করা হয় (চৌধুরী, ২০১১:১৫২)। উত্তর-পূর্ব অর্থাৎ সিলেট অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির পাহাড়গুলো বেশ উঁচু। এগুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম তাজিংডং (বিজয়)। এর উচ্চতা ১২৩১ মিটার। দ্বিতীয় উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম কেওক্কাডং। এর উচ্চতা ১২৩০ মিটার। দুটি পাহাড়ই বান্দরবান জেলায় অবস্থিত (মারুফা, ২০১০, পৃ. ৬৩)। দক্ষিণ-পূর্ব এ পাহাড়ি অঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলী, মাতামুহুরী, সাঙ্গু, হালদা ও নাফ। এ অঞ্চলটি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষে আবৃত। বৃক্ষরাজির মধ্যে শাল, সেগুন, কড়ই, গর্জন, গজারি, চাপালিশ, মেহগনি, রাবার, জাবুল, গামার, অর্জুন, চাম্বল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো বেশি উঁচু নয়। এদেরকে টিলা বলে। সিলেট-মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জের এসব ছোট ছোট পাহাড়গুলোতে বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান অবস্থিত। এ এলাকার নদীগুলোর মধ্যে সুরমা, কুশিয়ারা অন্যতম।

পুরাতন পলল গঠিত সমভূমি অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলের সুবিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাইস্টোসিন যুগের শেষে বরফ গলা পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবন সৃষ্টি হয়ে এসব উচ্চভূমি গঠিত হয় বলে ধারণা করা হয়। বরেন্দ্রভূমির আয়তন ৯,২৮৮ বর্গকিলোমিটার, মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ের আয়তন ৪,১০৫ বর্গকিলোমিটার এবং লালমাই পাহাড়ের আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার। বরেন্দ্রভূমির উচ্চতা ৬-১২ মিটার, মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ের উচ্চতা ৬-৩০ মিটার এবং লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২১ মিটার (চৌধুরী, ২০১১, পৃ ১৫৫-১৫৬)। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর। মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ে গজারি এবং শাল বৃক্ষের বন রয়েছে।



সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল :

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল এবং প্লাইস্টোসিন যুগের সোপানসমূহ ছাড়া দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল সাম্প্রতিককালের পলল সমভূমি। এ সমভূমি ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু। এ অঞ্চল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী এবং এদের উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলল মাটি দ্বারা গঠিত। এ সমভূমির গড় উচ্চতা ৯ মিটার (চৌধুরী, ২০১১:১৫৬)। বর্ষার সময় নদীগুলো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। প্রতি বছরই বন্যার পানিতে এ অঞ্চল প্লাবিত হয়, ফলে জমিতে প্রতিনিয়ত পলিমাটি পড়ে নতুন ভূমি গঠন করে। এই মাটি অনেক উর্বর।

অর্থনৈতিক কার্যাবলি, মানুষের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি, মানুষের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভূ-প্রকৃতির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যেমন-বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাহাড় থাকায় বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এ সকল পাহাড়ে বাধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়, যা কৃষিকাজে বিশেষ করে ইরি এবং বোরো ধান উৎপাদনে ব্যাপক সাহায্য করে। পাহাড়ি অঞ্চলে রয়েছে বিশাল বনভূমি, এসব বনভূমিতে প্রচুর মূল্যবান কাঠ এবং ফল পাওয়া যায়। শাল, সেগুন, কড়াই, গর্জন, গজারি, চাপালিশ, মেহগনি, রাবার প্রভৃতি মূল্যবান কাঠের গাছ এ অঞ্চলে রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে বাঁশ, বেত জন্মায়, যেগুলো ঐ অঞ্চলের কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব অঞ্চলে খনিজ সম্পদ বিশেষ করে গ্যাস এবং তেল পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের পাহাড়ের ঢাল ও টিলা গুলো চা চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পাহাড়ি এলাকার নদী গুলো খুবই খরস্রোতা হয়। এ এলাকার এরকম একটি নদী হল কর্ণফুলী। এ খরস্রোতা নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে এ সকল অঞ্চলে বহু শিল্প গড়ে উঠেছে। বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই উচ্চভূমি থেকে প্রচুর মূল্যবান কাঠ এবং ফল সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের বিশাল নদীবাহিত পলল মৃত্তিকার সমভূমিতে অতি সহজেই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই ঘন জনবসতিও গড়ে ওঠে। সমতলভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল সুন্দরবন গড়ে উঠেছে। এখানে পাওয়া সম্পদের মধ্যে প্রচুর কাঠ, মধু, পশু-পাখি বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত ও সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনাসমূহ দেখতে অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে ভিড় করে (চৌধুরী, ২০১১:১৫৯-১৬০, রহমান, ২০১০:২৬৩-২৬৪)।

পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীগণ সাধারণত বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, পরিশ্রমী, সাহসী, উৎসাহী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে। প্রতিকূল পরিবেশ এদের দৈহিক গঠন, চরিত্র এবং বসবাসের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সমভূমির ন্যায় যাতায়াত সহজ নয় বলে এরা বলিষ্ঠ। প্রায়ই বন্য জন্তুর সম্মুখীন হতে হয় বলে এরা যথেষ্ট সাহসীও হয়ে থাকে। কৃষি এবং বসবাস সহজ নয় বলে এরা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়। অন্যদিকে উর্বর সমভূমি অঞ্চলগুলোতে সহজেই ফসল উৎপাদন সম্ভব বলে মানুষ সহজে কৃষিকাজ করে। এখানকার যাতায়াতও সহজ বলে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। তবে নদীভাঙন এলাকা, বন্যাকবলিত এলাকা এবং সাগরপাড়ের অধিবাসীগণ প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয় বলে অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু। এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ সহজ-সরল জীবনযাপনের পাশাপাশি সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা করে

থাকে(চৌধুরী, ২০১১:১৫৯-১৬০)। সুতরাং দেখা যায় ভূ-প্রকৃতি কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যাবলি, মানুষের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

নদ-নদী

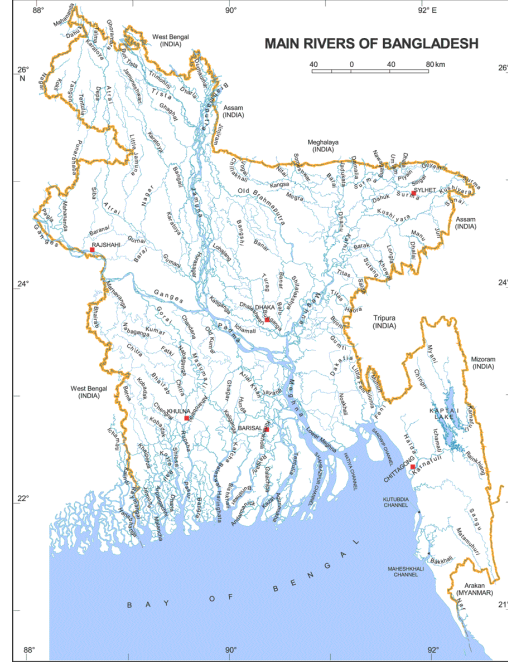
বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের নদ-নদীর মানচিত্রে লক্ষ করলে দেখা যায়, দেশজুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী এবং তার শাখা-প্রশাখা। এগুলোর মধ্যে পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কর্ণফুলী এবং তিস্তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এসব নদীর শাখানদী এবং উপনদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০-এর মতো।

পদ্মা : গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্যতম নদী গঙ্গা। মধ্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে এ নদী ভারতের দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গা নদীর একটি শাখা পদ্মা নামে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবেশ করেছে এবং গোয়ালন্দের কাছে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। পদ্মা নদী আরো ১০৪ কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। পদ্মা নদীর প্রধান শাখা নদীগুলোর মধ্যে ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর উপনদীগুলো হলো পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, মহানন্দা (রহমান, ২০১০:২৭২)।

ব্রহ্মপুত্র : ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের কৈলাস পর্বতের একটি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে তিব্বত ও আসামের মধ্য দিয়ে কুড়িগ্রামের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। প্রথম শাখাটি যমুনা নামে দক্ষিণ দিকে ২৭৭ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় শাখাটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবের কাছে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা নদী বংশী ও শীতলক্ষ্যা এবং প্রধান উপনদী ধরলা ও তিস্তা।

যমুনা : জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দৌলতদিয়ার কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। যমুনা নদীর প্রধান শাখা নদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা। এর উপনদীগুলো হলো ধরলা, করতোয়া, আত্রাই প্রভৃতি (রহমান, ২০১০:২৭২)।

মেঘনা : ভারতের বরাক নদী সিলেট সীমান্তে সুরমা এবং কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং আজমিরিগঞ্জের কাছে মিলিত হয়ে কালনী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পরে মেঘনা নাম ধারণ করে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। সোমেশ্বরী, কংস, গোমতী প্রভৃতি মেঘনার উপনদী এর শাখা নদীগুলোর মধ্যে তিতাস ও ডাকাতিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (রহমান, ২০১০:২৭৪)।



কর্ণফুলী : কর্ণফুলী নদী লুসাই পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে ২৭.৪ কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী। কাসালং, হালদা, মাইনী, চেন্দী প্রভৃতি কর্ণফুলী নদীর উপনদী এবং শাইলখ ও বোয়ালখালী এর প্রধান শাখা নদী (রহমান, ২০১০:২৭৪)।

বাংলাদেশের কৃষি, অর্থনৈতিক কার্যাবলি, মানুষের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নদ-নদীর প্রভাব :

বাংলাদেশের কৃষি, অর্থনৈতিক কার্যাবলি, মানুষের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নদ-নদীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এর জন্য নদ-নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদ-নদী বর্ষাকালে দু'কূল প্লাবিত হয়ে প্রচুর পলিমাটি সঞ্চিত করে যা ধান, পাট, গম চাষে খুবই উপযোগী। অন্যদিকে শুকনো মৌসুমে কৃষিকাজে প্রচুর সেচের প্রয়োজন হয়। এ সকল নদ-নদী থেকে সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) প্রকল্প, তিস্তা বাঁধ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, মেঘনা-ধোনাগোদা প্রকল্প প্রভৃতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জমি সেচ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে (রহমান, ২০১০:২৭৪-২৭৫)।

বাংলাদেশে সড়ক পথের যথেষ্ট সম্প্রসারণ হলেও এখনো অধিকাংশ বাণিজ্য নদীপথে পরিচালিত হয়ে থাকে, ফলে প্রধান নদীগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নদীবন্দর। তাছাড়া এ সকল নদ-নদী বিশাল মৎস্যভাণ্ডার। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি নদী থেকে প্রচুর ইলিশ, রুই, কাতলা, বোয়াল, চিতল, চিংড়ি প্রভৃতি মাছ ধরা পড়ে। এগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশ যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তেমনি এ অঞ্চলের মানুষের আমিষের অভাব পূরণ করছে। শিল্পকারখানায় ও কৃষিকাজে প্রচুর পানির প্রয়োজন, নদীগুলো সে চাহিদা মেটাচ্ছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের শিল্পকারখানায় বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা, চট্টগ্রাম শিল্পকারখানায় কর্ণফুলী, রাজশাহী শিল্পকারখানায় পদ্মা, খুলনা শিল্পকারখানায় রূপসা, সিলেট শিল্পকারখানায় সুরমা এবং বরিশাল শিল্পকারখানায়

কীর্তনখোলা নদী থেকে পানি সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের নদী থেকে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে প্রায় ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে (রহমান, ২০১০:২৭৪-২৭৫)।

জলবায়ু

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এ দেশের জলবায়ুর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এবং দক্ষিণে বিশাল জলরাশি থাকায় এ দেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। বাংলাদেশের উত্তর দিকে এশিয়ার প্রায় মধ্যভাগে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা হিমশীতল বায়ুপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, তাই বাংলাদেশে তীব্র শীত অনুভূত হয় না। আবার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থাকায় গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প বহন করে আনে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এর ফলে গরমের তীব্রতাও হ্রাস পায়। বছরকে ছয়টি ঋতুতে ভাগ করলেও জলবায়ুর ভিত্তিতে বাংলাদেশে মাত্র তিনটি সুনির্দিষ্ট ঋতু লক্ষ করা যায়। এ ঋতুগুলো হলো-গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু (মারুফা, ২০১০)।

মার্চ থেকে মে (ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ঋতু। গ্রীষ্ম সবচেয়ে উষ্ণতম ঋতু। এ ঋতুতে সাধারণত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। এপ্রিল উষ্ণতম মাস। এপ্রিল-মে মাসে প্রচণ্ড বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টি হয়। এই ঝড়-বৃষ্টিকে কালবৈশাখী বলে। অনেক সময় কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। ঝড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়। তবে বৃষ্টিপাতে কৃষির উপকার হয়।

গ্রীষ্মের পরই বর্ষা ঋতু শুরু হয়। বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষা ঋতু স্থায়ী হয়। এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির নিকটে থাকায় বায়ুচাপের তারতম্য ঘটে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে আসায় প্রচুর জলীয়বাষ্প বহন করে এবং বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ সময় দেশে সারা বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০% সংঘটিত হয়। এ সময় সর্বনিম্ন ১১৯ সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ ৫৩৭ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত ৩৪০ সেন্টিমিটার। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় সিলেটের লালখানে (প্রায় ৩০৪ সেন্টিমিটার)। বর্ষাকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। প্রতি বছর নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে শীতকাল থাকে। এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায় বাংলাদেশে এর রশ্মি তীর্যকভাবে পড়ে এবং তাপমাত্রা যথেষ্ট কমে যায়। এই সময় মধ্য এশিয়ার শীতল বাতাস উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু হিসাবে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জানুয়ারি মাস সবচেয়ে শীতলতম মাস। উপকূলীয় অঞ্চলে শীত একটু কম এবং উত্তর অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শীত বেশি অনুভূত হয়। শীতকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৬.৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা প্রায় ১২.৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর-পূর্বের শুষ্ক অঞ্চল থেকে আসা শীতল বায়ু জলীয়বাষ্প শূন্য থাকায় বৃষ্টি খুব কম হয়।

অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর জলবায়ুর প্রভাব

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি জলবায়ুর ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ দেশের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে কৃষি হতে। আর কৃষির উৎপাদন আবার সম্পূর্ণ জলবায়ুর আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের কৃষিকাজের ওপর জলবায়ুর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। মৌসুমি জলবায়ুবিশিষ্ট বাংলাদেশের জলবায়ুতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয় বলে এক এক ঋতুতে এক এক ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে অধিক উত্তাপ ও বৃষ্টি সহকারী ফসল যেমন-ধান, পাট, ইক্ষু, চা; শীতকালে মৃদু উত্তাপ ও মৃদু শীত সহকারী ফসল যেমন-গম, ভুট্টা, তুলা, যব, ডাল, সরিষা, শাক সবজি, পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু এ দেশে কার্পাস বয়ন ও পাট বয়ন শিল্প প্রসারের সহায়ক। বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জলবায়ুতে এ পরিবর্তনগুলো কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে দেশে বিভিন্ন ঋতুর আগমন ও প্রস্থান, বিভিন্ন ঋতুর তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিগত প্রায় এক যুগ ধরে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, মাঘ-ফাল্গুন পার হওয়ার পরও চৈত্র-বৈশাখ মাসে দেশের উত্তরাঞ্চলে রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় এবং দুপুর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো বছর বর্ষাকাল পূর্বের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ হয়। এর অন্যতম কারণ হলো বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ছে। ব্যাপক হারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে এবং যত্রতত্র শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের ফলে বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে (চৌধুরী, ২০১০:১৭০)। ফলে জলবায়ুতে এ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াগত কারণে আবহমানকাল থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে। তাই বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বলা হয়। এখানে প্রতি বছর কোনো না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। কখনো কখনো তা প্রলয়ংকরী রূপ নেয়। উত্তর গোলাার্ধের ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান। এদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে প্রসারিত হিমালয় পর্বতের অবস্থান জলবায়ুকে আরো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এ দুটি বাংলাদেশকে জলবায়ুর চরম অবস্থা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু মানুষের অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির ব্যবহারের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ নেমে আসছে। মূলত পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বাংলাদেশে প্রতি বছর সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো হলো-(১) বন্যা (২) খরা (৩) ঘূর্ণিঝড় (৪) টর্নেডো (৫) জলোচ্ছ্বাস (৬) কালবৈশাখী (৭) নদীভাঙন (৮) ভূমিকম্প। প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে এগুলো সংঘটিত হয়ে থাকে। তথাপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপ এগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যেমন-মানুষ কর্তৃক ব্যাপক হারে বৃক্ষরাজি কর্তন এবং নদী, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি অপরিকল্পিতভাবে ভরাট করা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদির কারণে কোথাও কোথাও অধিক বন্যা হয়ে থাকে। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার, অপরিকল্পিত ও মাত্রাতিরিক্ত চাষাবাদ খরার একটি অন্যতম কারণ। এছাড়া এসব দুর্যোগের অনেকগুলো বিশ্বের আবহাওয়া উষ্ণায়নের ফলে ঘটে থাকে, যা মানুষের গৃহীত কর্মকাণ্ডের কারণে হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। ক্ষতিগ্রস্ত করে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মানুষের ঘরবাড়ি ও থাকার পরিবেশের। মানুষের জীবনকে করে তোলে বিপর্যস্ত। এ অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা। এজন্য প্রয়োজন তিন ধরনের কার্যকলাপ, যথা-(১) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (২) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও (৩) পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা।

১। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- খাল খনন ও সংস্কার করে পানি নিষ্কাশন ও চলাচলের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যাপ্ত বনায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে।
- বন নিধন ও গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় বাঁধ, ড্যাম ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে।
- পরিকল্পিতভাবে ঘর-বাড়ি ও শিল্প-কারখানা তৈরি করতে হবে ও এ লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলতে হবে।
- পানির ব্যবহারে সচেতন হতে হবে।

এসব কাজের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রকোপ ও প্রভাব কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

২। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সংকেত দিতে হবে এবং জনগণকে সে অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- উঁচু ও নিরাপদ জায়গায় ঘর-বাড়ি তৈরি করতে হবে।
- দুর্যোগকালীন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, ওষুধ ইত্যাদি মজুত করে রাখতে হবে।
- দুর্যোগে প্রয়োজনে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হবে।

৩। পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।
- দুর্গতদের জন্য দ্রুত খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, বাঁধ, পানি নিষ্কাশনের জায়গা ইত্যাদি মেরামত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এসব কাজে সম্ভবমতো অংশ নেবে। শিক্ষকের দায়িত্ব এসব কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করা ও সম্ভবমতো সহযোগিতা করা।

উপরোক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া আমাদের দেশে প্রতি বছর আগুন লেগে জান ও মালের প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে। আগুন লাগা মানুষের সৃষ্ট একটি দুর্যোগ। সতর্কতার সাথে জীবনযাপন করলে আগুন লাগা অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়। অতএব, এ বিষয়েও আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীদেরকেও সচেতন করতে হবে।

অধ্যায় ৮

মানচিত্র : অঙ্কন ও ব্যবহার

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের বিভিন্ন পাঠ পরিচালনায় মানচিত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ শিক্ষকের মানচিত্র অঙ্কন ও ব্যবহারের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

মানচিত্র কী

সাধারণত মানচিত্র বলতে বড় আকারের কোনো এলাকাকে নির্দিষ্ট অনুপাতে ছোট করে আঁকা প্রতিকৃতিকে বুঝায়। মানচিত্র হলো কতকগুলো প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে কোনো ভূপৃষ্ঠের বস্তু, এলাকা এবং বিষয়ের চিত্র প্রদর্শন করাকে বুঝায়। ম্যাপ (Map) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘ম্যাপ্পা’ (Mappa) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ‘ম্যাপ্পা’ শব্দ দ্বারা একখণ্ড কাপড় বা একটি রুমাল বা টেবিলের আচ্ছাদনের মতো আবরণী কাপড় বুঝায় (রউফ এবং মাহমুদ, ২০১০, পৃ. ২৮৭)।

একটি মানচিত্র সমগ্র পৃথিবী বা তার কোনো অংশ বিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থাপন করে। যখন কোনো ছোট আয়তন যেমন-ঘর, বাড়ি, বিদ্যালয় প্রভৃতিকে উপস্থাপন করা হয় সেটিকে নকশা (Sketch) বলে। মানচিত্র অঙ্কনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। এক টুকরো কাগজের ওপর হুবহু সমগ্র পৃথিবী, কোনো মহাদেশ, দেশ, জেলা, ইউনিয়ন বা কোনো গ্রামের মতো বড় আকারের এলাকা উপস্থাপন করা যায় না। বিশেষ কিছু কলাকৌশল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে একটি কাগজে (সমতল ক্ষেত্র) কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে চিত্রে উপস্থাপন করা হয়। রউফ এবং মাহমুদ (২০১০)-এর মতে, “সমগ্র পৃথিবী অথবা এর কোনো অংশের প্রতিকৃতি সঠিক দিক অনুসারে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমতল কাগজের ওপর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা দ্বারা সৃষ্ট ছকের ভিতরে অঙ্কন করা হলে তাকে মানচিত্র বলে।”

মানচিত্রের প্রকারভেদ

মানচিত্র বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কী উদ্দেশ্যে মানচিত্রটি ব্যবহৃত হবে তার উপর ভিত্তি করে যে যে মানচিত্র হয় তার কিছু প্রকার নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। মৌজা মানচিত্র (Cadastral Map) : ভূমি ও বিল্ডিং এর মালিকানার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাই মৌজা মানচিত্র। এ মানচিত্রে নিখুঁতভাবে সীমানা নির্ধারিত থাকে।

২। ভূস্থানিক মানচিত্র (Topographic Map) : প্রকৃত জরিপকার্যের মাধ্যমে ভূস্থানিক মানচিত্র তৈরি করা হয়। এ ধরনের মানচিত্রে সাধারণত প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান দেখানো হয়ে থাকে। যেমন: পাহাড়, সমভূমি, নদ নদী, রেলপথ, হাট বাজার ইত্যাদি নিখুঁতভাবে দেখানো হয়।

৩। দেয়াল মানচিত্র (Wall Map) : মানুষের চাহিদা মোতাবেক যখন কোন একটি মহাদেশ, দেশ ও দেশের একেকটি অংশকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয় তাকে দেয়াল মানচিত্র বলে। মূলত শ্রেণিকক্ষে ও দেয়ালে প্রদর্শনের জন্য এ ধরনের মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

৪। মৃত্তিকা বিষয়ক মানচিত্র (Soil Map): মাটির ধরনের উপর ভিত্তি করে এ মানচিত্র তৈরি করা হয়।

৫। প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Map) : মানচিত্রে যখন কোন দেশ বা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভূমিরূপ যেমন-পর্বত, মরুভূমি, নদী, হ্রদ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে তখন সে মানচিত্রই হলো প্রাকৃতিক মানচিত্র।

৬। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র (Geological Map) : ভূত্বক গঠনকারী শিলাসমূহের অবস্থান ও গঠনের ওপর ভিত্তি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র বলে।

৭। জলবায়ুগত মানচিত্র (Climatic Map): বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে জলবায়ুগত মানচিত্র বলে।

৮। উদ্ভিজ্জ বিষয়ক মানচিত্র (Vegetation Map) : বিশ্বের কোথায় কোন ধরনের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ আছে তার উপর ভিত্তি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে উদ্ভিজ্জ মানচিত্র বলে।

৯। ভূচিত্রাবলি বা এটলাস মানচিত্র (Chorographical or Atlas Map) : মানচিত্রের সমষ্টিকে ভূচিত্রাবলি বা এটলাস মানচিত্র বলে। এতে প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষিভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানচিত্র তৈরি করা হয়।

১০। সাংস্কৃতিক মানচিত্র (Cultural Map): বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের সীমা, ঐতিহাসিক কোন স্থান বা স্থাপত্য, বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাই সাংস্কৃতিক মানচিত্র। রাজনৈতিক মানচিত্র, বন্টন মানচিত্র, ঐতিহাসিক মানচিত্র, সামাজিক মানচিত্র ইত্যাদি সাংস্কৃতিক মানচিত্রের বিভিন্ন প্রকার।

মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ

মানচিত্রে দেশ, মহাদেশ, মহাসাগর বা অন্য কোনো কিছুর সঠিক অবস্থান নির্দেশ করার জন্য অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা রেখার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা রেখা অনুসরণ করে মানচিত্র অঙ্কন করলে তা নির্ভুল হয়। মূল মধ্যরেখার (যার মান 0° এবং গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত) পূর্বে এবং পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর যে রেখা অঙ্কন করা হয় তাকে দ্রাঘিমা রেখা বলে। মূল মধ্যরেখা ও পৃথিবীর কেন্দ্রের সাথে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে দ্রাঘিমাংশ বলে। অন্যদিকে নিরক্ষীয় বৃত্তের সমান্তরাল করে উত্তরে এবং দক্ষিণে যে বৃত্ত অঙ্কন করা হয় তাকে অক্ষরেখা বলে। বিষুবরেখা ও পৃথিবীর কেন্দ্রের সাথে কোনো স্থান যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে অক্ষাংশ বলে।

মানচিত্র অঙ্কনে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়সমূহ

মানচিত্রে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, শহর-বন্দর, রাস্তা, রেলপথ, সীমারেখা প্রভৃতির অবস্থান দেখানো হয় এবং এর জন্য কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর সব দেশে একই ধরনের প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এ চিহ্নগুলো সাধারণত মানচিত্রের শিরোনামের নিচে থাকে। কাগজের উপরের অংশে তীর চিহ্ন বা অনুরূপ কোনো প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করে মানচিত্রের দিক নির্দেশ করা হয়।

মানচিত্র অঙ্কন করার পর চারিদিকে সরু ও মোটা রেখা দিয়ে বহিঃসীমারেখা অঙ্কন করা হয়। বহিঃসীমা এমনভাবে অঙ্কন করতে হবে যেন কোনো অংশ মানচিত্রের বাইরে না থাকে এবং মানচিত্রের শিরোনাম, সূচি প্রভৃতি সহজে দেখানো যায়। শিরোনাম মানচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিরোনাম না থাকলে সহজে বোঝা যায় না এটি কিসের মানচিত্র। মানচিত্রের সকল ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন বা রং ব্যাখ্যা করার জন্য শিরোনামের নিচে বা কাছে একটি সূচি অপরিহার্য। উপরোক্ত উপাদান ছাড়াও কোনো কোনো মানচিত্রে শিট নম্বর উল্লেখ করতে হয়। মানচিত্রের প্রাকৃতিক অবয়বগুলো সহজে পরিবর্তন হয় না, কিন্তু রাস্তা-ঘাট, শহর-বন্দর প্রভৃতি সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়। তাই মানচিত্রে জরিপের তারিখ সংযোজন করতে হয়।

মানচিত্র অঙ্কন

কোনো মানচিত্র অঙ্কন করার আগে কতকগুলো বিষয় চিন্তাভাবনা করে মানচিত্র অঙ্কন করতে হয়। মানচিত্র অঙ্কনবিদকে জানতে হবে-মানচিত্র ব্যবহারকারী কে বা কারা? তাদের বয়স কত? মানচিত্রটি কী প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে? মানচিত্র কতটুকু সঠিক হওয়া প্রয়োজন? কোন কোন সংকেত ব্যবহার করতে হবে, মানচিত্রের স্কেল কী হবে? ইত্যাদি (রউফ এবং মাহমুদ, ২০১০:৩৩৪)। মানচিত্র অঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। মানচিত্র অঙ্কনের কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নরূপ (গ্রাফোসম্যান, 1996:73):

- **ট্রেসিং ও ছকবর্গ পদ্ধতি** : পূর্বে অঙ্কিত মানচিত্র হতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সুবিধাজনক স্কেলে পরিবর্তন করে নতুন মানচিত্র অঙ্কন করা হয়। ট্রেসিং পদ্ধতি এবং ছকবর্গের সাহায্যে সহজে মানচিত্র অঙ্কন করা যায়।
- **জরিপ পদ্ধতি**: ভূমি জরিপের মাধ্যমে নতুন মানচিত্র অঙ্কন করা হয়। এতে চেইন, টেপ, প্লেইন টেবল, কম্পাস লেবেলিং, প্রিজমেটিক কম্পাস, থিয়োডলাইট প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
- **এরিয়াল ফটোগ্রাফ (Aerial Photograph)** : আকাশ থেকে বিমান বা ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে ছবি নিয়ে এ ধরনের মানচিত্র অঙ্কন করা হয়।
- **জিআইএস (Geographic Information System)** : ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জিআইএস বলে। এটি কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থা। জিআইএস এর মাধ্যমে একটি মানচিত্রের মধ্যে তথ্যের বিশ্লেষণ করে মানচিত্রের উপযোগিতা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

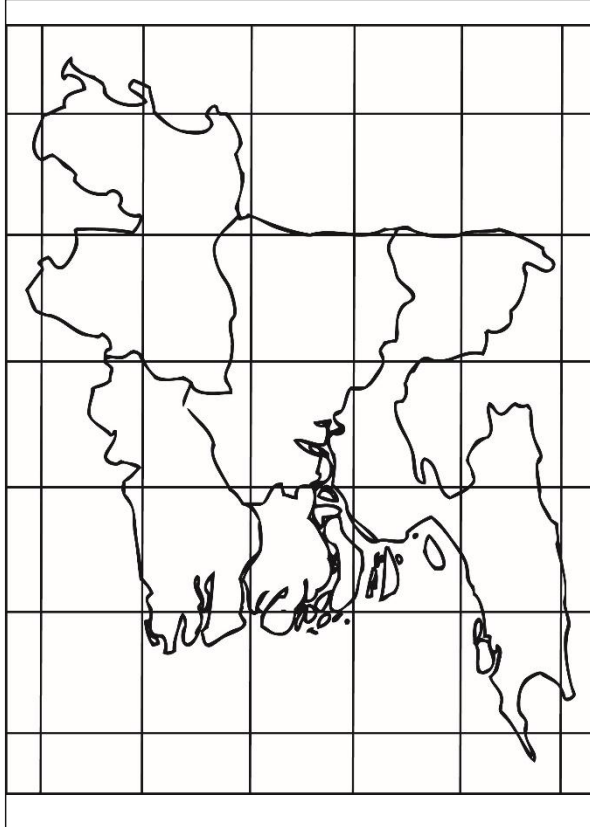
ট্রেসিং পদ্ধতিতে মানচিত্র অঙ্কন প্রণালী

পূর্বে অঙ্কিত মানচিত্র হতে মানচিত্র অঙ্কনের জন্য ট্রেসিং পদ্ধতি (ছাপ দিয়ে আঁকা) খুব সহজ একটি পদ্ধতি। ট্রেসিং পদ্ধতিতে মানচিত্র অঙ্কনের জন্য ট্রেসিং পেপার, পেনসিল/বল পেন, জেমস ক্লিপ, ইরেজার, ট্রেসিং টেবিল এবং স্কেল প্রয়োজন হয়। যে মানচিত্রটি আঁকতে হবে সে মানচিত্রটিকে ট্রেসিং টেবিলে রেখে তার ওপর সম-আকৃতির ট্রেসিং পেপার রেখে চারপাশ এমনভাবে জেমস ক্লিপ দিয়ে আটকাতে হবে যেন মানচিত্র এবং ট্রেসিং পেপারটি নড়াচড়া না করতে পারে। এখন ট্রেসিং টেবিলের লাইট জ্বালালেই

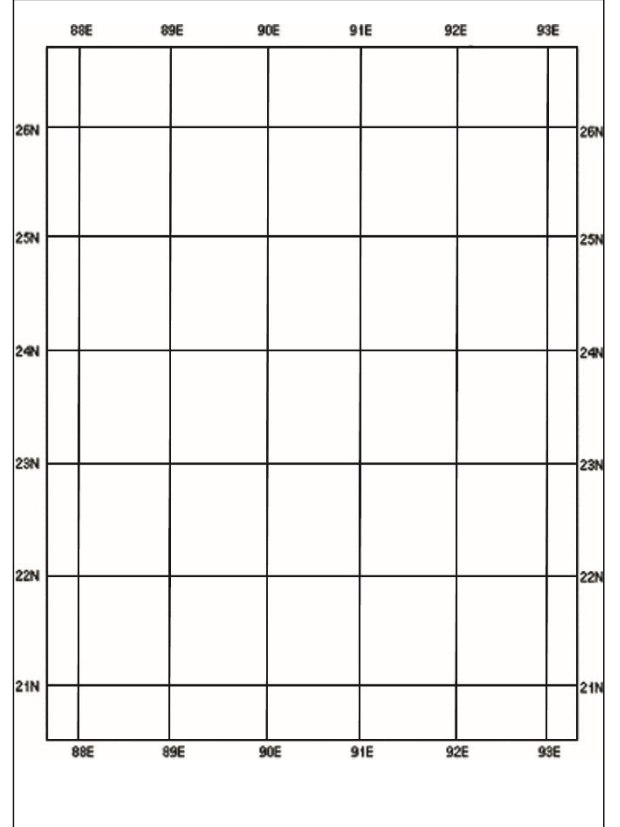
নিচের মানচিত্রটি স্পষ্ট দেখা যাবে। মানচিত্রটিতে যে রেখা যেভাবে আছে সে রেখাগুলো ট্রেসিং পেপারের ওপর পেনসিল/বল পেন দিয়ে দাগ টেনে মানচিত্রটি আঁকতে হবে। তারপর মানচিত্রের চারপাশ বহিঃসীমারেখা এঁকে মানচিত্রের শিরোনাম, দিক চিহ্ন এবং সূচি দিতে হবে। মানচিত্রটি অঙ্কন করার পর জেমস ক্লিপ সরিয়ে নিলেই মানচিত্রটি আঁকা শেষ হবে।

ছকবর্গ পদ্ধতিতে মানচিত্র অঙ্কন প্রণালী

পূর্বে অঙ্কিত মানচিত্র থেকে ছকবর্গের সাহায্যে সহজে মানচিত্র অঙ্কন করা যায়। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।



ছকচিত্রে বাংলাদেশের মানচিত্র



মানচিত্র আঁকার জন্য ছকবর্গ

প্রথম পর্যায়: যে মানচিত্রটি আঁকতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে। এরপর মানচিত্রের ওপর পেনসিল দিয়ে সমান দূরত্ব বজায় রেখে পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কয়েকটি রেখা আঁকতে হবে। রেখাগুলো এমনভাবে আঁকতে হবে যেন মানচিত্রটি পুরোপুরি ছকের ভিতর থাকে। এটি হবে মূল মানচিত্র। পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর রেখাগুলো পরস্পর ছেদ করে কয়েকটি ছকবর্গ তৈরি হবে। মানচিত্র ছোট করতে হলে ছকবর্গ ছোট করতে হবে এবং মানচিত্র বড় করতে হলে ছকবর্গ বড় করতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে মানচিত্রের স্কেল সমানুপাতিক হারে বড় বা ছোট করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: মানচিত্রের সম-আকৃতির একটি সাদা কাগজ নিতে হবে। সাদা কাগজে ছকবর্গ আঁকতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রথম মানচিত্রটিতে যে কয়টি ছকবর্গ অঙ্কন করা হয়েছিল সাদা কাগজে সেই কয়টি ছকবর্গ

অঙ্কন করতে হবে। মানচিত্রটি পূর্বের মানচিত্র অপেক্ষা দ্বিগুণ করতে হলে প্রতিটি ছকবর্গের দূরত্ব দ্বিগুণ করতে হবে। আর মানচিত্রটি পূর্বের মানচিত্র অপেক্ষা অর্ধেক করতে হলে প্রতিটি ছকবর্গের দূরত্ব অর্ধেক করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়: পূর্বের মানচিত্রের ছকবর্গের মধ্যে মানচিত্রের সীমানা রেখা এবং অন্যান্য বিষয়াদি যে যেভাবে আঁকা রয়েছে, অবিকল একইভাবে সাদা কাগজের ছকবর্গে সেই সীমানা রেখা এবং অন্যান্য বিষয়াদি আঁকতে হবে। এভাবে নতুন একটি মানচিত্র পাওয়া যাবে। তারপর মানচিত্রের চারপাশ বহিঃসীমারেখা আঁকে মানচিত্রের শিরোনাম দিতে হবে। দিক চিহ্ন দিতে হবে। মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয় বুঝানোর জন্য মানচিত্রের শিরোনামের নিচে বা সুবিধাজনক স্থানে সাংকেতিক চিহ্ন দিতে হবে। সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন অনুসরণ করতে হবে। পূর্বের মানচিত্রে যেভাবে স্কেল অঙ্কন করা আছে নতুন মানচিত্রে সেইভাবে স্কেল অঙ্কন করতে হবে। নতুন মানচিত্রের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশের বা সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বতের নাম লিখতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য পূর্বে অঙ্কিত মানচিত্র হতে ট্রেসিং পদ্ধতি এবং ছকবর্গের সাহায্যে মানচিত্র অঙ্কনের দক্ষতা অর্জন করা দরকার।

ভূমি জরিপের মাধ্যমে নতুন মানচিত্র অঙ্কন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এরিয়াল ফটোগ্রাফ এবং বর্তমানে কম্পিউটারে জিআইএস (Geographic Information System) মাধ্যমে সঠিকভাবে ইলেক্ট্রনিক মানচিত্র অঙ্কন করা যায়। তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়।

মানচিত্র ব্যবহারের গুরুত্ব

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ প্রকৃতি ও সমাজের নানাবিধ দিকের একটি সমন্বিত বিষয়। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, জনসংখ্যা ইত্যাদি। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের বিভিন্ন পাঠে মানসম্মত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় মানচিত্র ব্যবহার প্রয়োজন। মানচিত্র ব্যবহারের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) প্রাকৃতিক মানচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতির অবস্থান জানতে পারে।

খ) সাংস্কৃতিক মানচিত্র ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দেশের সম্পদ, জনমিতিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রের সীমা, প্রশাসনিক অঞ্চল, ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপত্য, বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে মূর্ত ধারণা ও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা যায়।

গ) মানচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ দেশ ও অন্যান্য দেশের স্থল, জল, আকাশ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে অবহিত করা যায়।

ঘ) কোন দেশের বিভিন্ন বন্দর, শহর, বাণিজ্য কেন্দ্রের অবস্থান বুঝানোর জন্য শিক্ষকের মানচিত্র ব্যবহার করা দরকার। মানচিত্র ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করা নানা দিক থেকে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানচিত্র সহকারে পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে আগ্রহী ও যত্নবান হতে হবে। এজন্য শিক্ষককে নানাবিধ মানচিত্র সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষক মানচিত্র তৈরি করবেন।

অধ্যায় ৯

বাংলাদেশের সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্য

জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রকৃতি থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায় সেগুলো হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি প্রাকৃতিক নানান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত মানুষ এগুলো তৈরি করতে পারে না। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ভূমি সম্পদ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, কৃষিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব সম্পদের সুবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারের ওপর দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে না পারার কারণে যেমন বহু দেশ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার পরও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হতে পারেনি, তেমনি যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে কম সম্পদের অধিকারী অনেক দেশও অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ওপর আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভরশীল।

কৃষিজ সম্পদ

কৃষি উৎপাদনের জন্য ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, পানির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লেখিত উপাদানসমূহ অনুকূলে থাকার কারণে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। বিস্তীর্ণ সমভূমি, উর্বর মাটি ও বৃষ্টিবহুল উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু এ দেশের মাটিকে উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। দেশের মোট ভূমির প্রায় ৬৫-৭৫ শতাংশ জমি আবাদযোগ্য, যা অন্যান্য কৃষিনির্ভর দেশের চেয়েও বেশি। খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল উভয় ধরনের আবাদই বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হয়ে থাকে। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ দেশের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিজ সম্পদ জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। মোট জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান হলো ১৪.৭৪% এবং ৪১% শ্রমশক্তি কৃষিখাতে নিয়োজিত। (বিবিএস ইকনমিক রিভিউ ২০১৭) বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ১৫ ভাগই হলো কৃষিজ পণ্য ও কাঁচামাল। নিম্নে বাংলাদেশের কয়েকটি কৃষিজ সম্পদের বর্ণনা দেয়া হলো।

১। খাদ্যশস্য : বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, ডাল, তেলবীজ, শাকসবজি, আলু, বিভিন্ন প্রকার মসলা ও ফলমূল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের মোট আবাদি জমির সিংহভাগ অংশে ধানের চাষ হয়। এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি ভূমি ব্যতীত প্রায় সব অঞ্চলেই ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। দেশীয় ধানের প্রধান তিনটি জাত হলো আউশ, আমন এবং বোরো। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে ধানের চাষ করা হলেও তুলনামূলকভাবে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা,

বরিশাল, পটুয়াখালী, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায় অধিক ধান উৎপন্ন হয়। অতীতে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন অনেকটা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে এদেশে আধুনিক কৃষিকাজ শুরু হওয়ায় কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাতের বীজ উদ্ভাবন করে খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে আধুনিক ইরি ধানের ব্যাপক আবাদ হচ্ছে।

অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে গম বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশি চাষ হয়। ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ঢাকা অঞ্চলে ডাল; কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, কুমিল্লা অঞ্চলে সরিষা, তিল, তিসি এবং ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় প্রচুর বাদাম উৎপন্ন হয়। এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে ভূট্টার ব্যাপক আবাদ হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮৮.১৪ লক্ষ মেট্রিকটন। (বিবিএস ইকনমিক রিভিউ ২০১৭)

২। **অর্থকরী ফসল:** যেসব ফসল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয় সেই সমস্ত ফসলকে অর্থকরী ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, চা, তামাক, ইক্ষু, তুলা, রেশম, রাবার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব ফসল বাজারজাত করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। এটি রপ্তানি করে প্রায় ৯.৮% বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় (চৌধুরী, ২০১১:১৯৬)। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাটের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পাটকে ‘সোনালি আঁশ’ বলা হয়। বাংলাদেশের জলবায়ু (২০ ডিগ্রি-২৫ ডিগ্রি সে. উত্তাপ এবং ২০০-২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত) ও উর্বর দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য খুব উপযোগী। এছাড়া সুলভ শ্রমিক, প্রয়োজনীয় মূলধন, সহজ পরিবহন এবং নিশ্চিত বাজার প্রভৃতি অর্থনৈতিক উপাদানের কারণে এ দেশে বিপুল পরিমাণ পাট উৎপাদন হয়। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই পাট চাষের উপযোগী। তবে রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে বেশি পাট উৎপন্ন হয়।

চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। এ দেশে উৎপাদিত চা-এর প্রায় ৬০% বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাহাড়ি এলাকায় যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এবং শীতের প্রকোপ কম এরূপ স্থান চা চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। চা চাষের ক্ষেত্রে মাটির P^h মানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৬টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে মৌলভীবাজার জেলায় সর্বাধিক ৯০টি, হবিগঞ্জে ২৩টি এবং সিলেট জেলায় ১৯টি চা বাগান রয়েছে। দেশের মোট উৎপাদনের ৮০% চা এসব বাগানেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলায় ১৪টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রাঙ্গামাটি জেলায় ১টি করে ২টি এবং পঞ্চগড় জেলায় ৭টি চা বাগান রয়েছে (চৌধুরী, ২০১১:১৯৬)।

অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে তামাক, তুলা, রাবার ও রেশম উল্লেখযোগ্য। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা এবং কুষ্টিয়ায় তামাক, যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় তুলা; বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে রাবার এবং রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে রেশম উৎপাদিত হয়।

বনজ সম্পদ

কোনো দেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া শোধন, মাটির ক্ষয়রোধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও অন্যান্য নানাবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাতে সে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২০-২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৫,৯৭৪.৯৪ বর্গকিলোমিটার; অর্থাৎ দেশের আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭.৬০ ভাগ (চৌধুরী, ২০১১:২২২)। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় এটি মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তদুপরি জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মানুষের ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণে এসব বনভূমি থেকে প্রাপ্ত কাঠ ব্যবহারের ফলে দেশের বনভূমি ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে।

জলবায়ু, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বনভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় (চৌধুরী, ২০১১:পৃ-২২৪), যেমন-

- ১। ক্রান্তীয় চিরসবুজ (হরিৎ) ও পাতাঝরা (পত্র পতনশীল) বৃক্ষের বনভূমি;
- ২। ক্রান্তীয় পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি;
- ৩। শ্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি

১। ক্রান্তীয় চিরসবুজ (হরিৎ) ও পাতাঝরা (পত্র পতনশীল) বৃক্ষের বনভূমি : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়ি এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এ বনভূমি বিস্তার লাভ করেছে। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১৫,৩২৬ বর্গকিলোমিটার। তার মধ্যে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলাতেই বনভূমির পরিমাণ বেশি। এর আয়তন ১২,১৩০ বর্গকিলোমিটার। কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার বনভূমির আয়তন প্রায় ২,১৪১ বর্গকিলোমিটার এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাতে ৭৯৬ বর্গকিলোমিটার বনভূমি রয়েছে। এছাড়া শেরপুর ও ময়মনসিংহের উত্তর সীমানায় সামান্য বনভূমি রয়েছে (চৌধুরী, ২০১১:২২৬)। বাংলাদেশের এসব বনভূমির গাছগুলো গড়ে ২৪-৩০ মিটার উঁচু হয়। পরিমিত তাপমাত্রা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বনভূমির গাছের পাতা সব সময় সবুজ দেখায়, তাই একে চিরসবুজ বা চিরহরিৎ বনভূমি বলা হয়। চিরসবুজ বৃক্ষের মধ্যে চাপালিশ, তেলসুর, মেহগনি, ময়না প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া এ বনভূমিতে চম্পা, জলপাই, কদম, ছাতিম, পিঠালী, জারুল, গর্জন, গামার, সেগুন, কড়ই, পিতরাজ, চাম্বল, কাঞ্চন, নাগেশ্বর ইত্যাদি পাতাঝরা বৃক্ষও রয়েছে। এ বনভূমিতে কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজ সম্পদের মধ্যে বাঁশ, বেত,

ওষুধি গাছ, মোম, মধু, পশুপাখি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গর্জনবৃক্ষ আসবাবপত্র ও রেলওয়ের স্লিপার তৈরি এবং বার্নিশের কাজে ব্যবহার করা হয়। সেগুন কাঠ আসবাবপত্র নির্মাণে, চাপালিশ কাঠসিন্দুক ও নৌকা তৈরি, গামার কাঠ দরজা ও জানালা তৈরি এবং জারুল স্লিপার ও জাহাজ নির্মাণে, বাঁশ কাগজ শিল্পে ব্যবহার করা হয় (চৌধুরী, ২০১১:২২৬-২২৭)।

২। ক্রান্তীয় পাতাঝরা (পত্র পতনশীল) বৃক্ষের বনভূমি (শালবন) : এ বনভূমি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় (১,১৬৪ বর্গকিলোমিটার) এবং রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় (৩৯ বর্গকিলোমিটার) অবস্থিত (রহমান, ২০১০:২৯৮)। এসব বনভূমির গাছগুলো গড়ে ১৫-২৪ মিটার উঁচু হয়। বছরের শীতকালে এ বনভূমির পাতা একেবারে ঝরে যায়। এ বনভূমিতে প্রধানত শালগাছ জন্মে বিধায় এটি ‘শালবন’ হিসেবেও পরিচিত। তবে শাল বা গজারি গাছ ছাড়াও এ বনভূমিতে ছাতিম, কাঁঠাল, কেলিকদম্ব, হরীতকী, বহেড়া, হিজল, কৃষ্ণী, নিম, শিরিষ, কড়ই প্রভৃতি বহু মূল্যবান গাছ জন্মে। শাল বা গজারী ব্যাপকভাবে ঘরের খুঁটি ও জ্বালানি হিসেবে, ছাতিম টেক্সটাইল ও অন্যান্য মিলে মাড় হিসেবে ব্যবহার করা হয় (মারুফা, ২০১০:৩৬৮)।

৩। স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি : সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত ও জোয়ার-ভাঁটা প্রভাবিত উদ্ভিদকে স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরানবনভূমি বলা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমগ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত সুন্দরবন (সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার আংশিক) এবং নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে এ বনভূমি গড়ে উঠেছে। সুন্দরবন বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান ম্যানগ্রোভ বন অঞ্চল। এর মোট আয়তন প্রায় ৬,৭৮৬ ব.কি.মি.। সুন্দরবনের বেশিরভাগ অংশ (৬,৭২৪ ব.কি.মি.) সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে অবস্থিত। মাত্র ৬২ বর্গ কি.মি. বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। নদীবাহিত উর্বর পলিমাটি, লোনা পানি, পরিমিত উত্তাপ, প্রচুর বৃষ্টিপাত, বিরল জনবসতি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ামকের প্রভাবে এ বনভূমি গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, গুল্ম ও পরগাছা পাওয়া যায়। এ বনভূমির বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরী প্রধান। এছাড়া কেওড়া, গেওয়া, গরান, ধুন্দল, বায়েন, পশুর এবং গোলপাতা ও ঝোপজাতীয় উদ্ভিদও রয়েছে। কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজ সম্পদের মধ্যে বাঁশ, বেত, ওষুধি গাছ, মোম, মধু পশুপাখি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বনভূমি হতে প্রাপ্ত কাঠ আসবাবপত্র, ঘরের খুঁটি, জ্বালানি এবং কাগজ, দিয়াশলাই ও পেন্সিল তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গোলপাতা ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুন্দরবনে প্রায় ২৬৯ প্রজাতির বন্য জীবজন্তুর বাস। এখানে বাঘ, হরিণ, বানর,

কুমির এবং নানা জাতের পাখি বসবাস করে। পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনভূমিতেই বাস করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মধু এ বন এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী থেকে সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বনজ সম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ৬ ভাগ (চৌধুরী, ২০১১: ৩০০)। মানুষের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, খুঁটি ও জ্বালানি বনভূমি হতে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও কৃষিকাজের ওপরও বনভূমির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বনভূমি আবহাওয়ার আর্দ্রতা রক্ষা করে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বন্যা ও প্লাবনের হাত থেকে মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে, এবং বৃক্ষের পাতা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ এদেশের বিভিন্ন শিল্পের (যেমন-কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, রেয়ন, দিয়াশলাই, হার্ডবোর্ড, বেত, পেঙ্গিল ইত্যাদি) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বনভূমি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বনভূমি সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সেই সাথে বেশি পরিমাণে গাছ লাগানো এবং বৃক্ষ সংরক্ষণের ব্যাপারে দেশের জনগণকে সচেতন করতে হবে। এতে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ও মরুकरण রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া বন এবং বন্য প্রাণি পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করে বিধায় বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পকেও লাভবান করা সম্ভব। এভাবে বনজসম্পদ জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে থাকে।

মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, ডোবা, হাওড় ও অন্যান্য ধরনের জলাশয় রয়েছে। এসব জলাশয়ে মাছসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ পাওয়া যায়। যেমন-রুই, কাতলা, বোয়াল, ইলিশ, চিতল, চিংড়ি, কৈ, মাগুর, শিং, পুঁটি, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি। বাংলাদেশের মৎস্যের উৎপাদন ক্ষেত্রের অবস্থান অনুযায়ী মৎস্য ক্ষেত্রগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-(ক) অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র এবং (খ) সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র।

ক) অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, হাওড়-বাঁওর, ধান ও পাটক্ষেত এবং নদীর মোহনা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মৎস্যকে অভ্যন্তরীণ বা মিঠা পানির মৎস্য বলা হয়। এ অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬০০ একর। অভ্যন্তরীণ মিঠা পানির মৎস্যের মধ্যে রয়েছে ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, বাউস, কালি

বাউস, আইড়, বোয়াল, পাঙ্গাস, চিতল, শোল, গজার, কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, পুঁটি, বাটা, চিংড়ি, কঁকড়া প্রভৃতি। প্রকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন—

১। নদ-নদী বা প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ

২। বদ্ধ জলাশয়, পুকুর, দিঘি

৩। কৃত্রিম জলাশয়

৪। নদীর মোহনা

৫। জলমগ্ন শস্যক্ষেত্রসমূহ।

১। নদ-নদী বা প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ : বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক জলাশয়ের অন্তর্গত। সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের হাওড়সমূহ প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের একটি প্রধান উৎস। এদেশের প্রায় ৭ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নদীতে মৎস্য ধরা হয়। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোতে সবচেয়ে বেশি মাছ পাওয়া যায়। নদীতে যেসব মাছ পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, আইড়, বোয়াল, পাঙ্গাস, চিতল, গজার, চিংড়ি প্রভৃতি প্রধান।

২। বদ্ধ জলাশয়, পুকুর, দিঘি : বাংলাদেশের বৃহত্তর বরিশাল, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় দিঘি ও পুকুরের সংখ্যা বেশি। এসকল দিঘি ও পুকুরে রুই, কাতলা, পাঙ্গাস, শোল, গজার, কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, পুঁটি প্রভৃতি মাছ চাষ করা হয়। বর্তমানে ময়মনসিংহের ভালুকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যিকভাবে কুমিরের চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বাণিজ্যিকভাবে এটি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এটি বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এদেশের বদ্ধ জলাশয়, পুকুর, দিঘি ইত্যাদিতে কাছিম চাষেরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

৩। কৃত্রিম জলাশয় : বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার কাণ্ডাই হ্রদটি অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রগুলোর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি দেশের একমাত্র বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়। কর্ণফুলী নদীতে কাণ্ডাই হ্রদের মুখের নিকটে পানি বিদ্যুৎ-এর জলাধার তৈরি করতে গিয়ে এ হ্রদটি সৃষ্টি হয়। এখানে বহু মূল্যবান মাছের চাষ করা হয়। এর মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কৈ, শিং, মাগুর, গজার, শোল প্রভৃতি প্রধান। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলের মিঠা পানিতে গলদা এবং লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ীর

ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। এছাড়াও এ অঞ্চলে কোরাল, ফাইসা, টেংরা, বাইলা, রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছের চাষ করা হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে রাজকাঁকড়ারও চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে ময়মনসিংহ এবং রংপুর অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে মাছ চাষের নিরব বিপ্লব ঘটেছে। এ অঞ্চলের মাছের মধ্যে পাঙ্গাস, কৈ, পুঁটি, শিং, মাগুর, টেংরা, শোল, বোয়াল, রুই, কাতলা ও মৃগেল উল্লেখযোগ্য।

৪। নদীর মোহনা : নদীর মোহনা ও উপকূলবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলের প্রায় ৪,৫৩,০০০ একর এলাকা এ মৎস্যক্ষেত্রের অন্তর্গত। মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানির মিলনস্থলে এ মৎস্যক্ষেত্র অবস্থিত। এখানে স্বাদু ও লবণাক্ত উভয় প্রকার পানির মৎস্যই পাওয়া যায়। এ এলাকায় চিংড়ি, ইলিশ, আইড়, ভেটকি ও তপসে মাছ পাওয়া যায়। তবে এ এলাকায় ধৃত মৎস্যের মধ্যে চিংড়ির পরিমাণই বেশি।

৫। জলমগ্ন শস্যক্ষেত্রসমূহ : প্লাবন সমভূমির ধান ও পাটক্ষেতগুলো বর্ষাকালে পানিতে পূর্ণ হয়ে মৎস্য বিচরণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। স্বল্পস্থায়ী এসব মৎস্য ক্ষেত্রগুলো মাছের খাদ্য ও বংশ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এ সময় ধান ও পাটক্ষেতের পোকামাকড়, কেঁচো, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি খেয়ে মাছগুলো খুব দ্রুত পুষ্ট হয় এবং ডিম প্রসব করে বংশবৃদ্ধি করে। বিভিন্ন মাছের মধ্যে কৈ, শিং, মাগুর, শোল, চেলা, পুঁটি, সরপুঁটি প্রভৃতি প্রধান।

খ) সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র : বাংলাদেশের দক্ষিণের প্রায় ৭৩২ কিলোমিটার উপকূল রেখা বরাবর প্রায় ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৩২ একর অঞ্চলব্যাপী এ মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এ এলাকায় প্রায় ১৮টি প্রজাতির চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভেটকি, লেট্টা, চেলা, পোয়া, রূপচাঁদা, ভারতীয় স্যামন, ছুরিমাছ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো-নদী ভরাট, খাল-বিল ভরাট, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, কীটনাশক ওষুধের প্রতিক্রিয়া, কলকারখানার বর্জ্যের প্রভাবে পানি দূষিত হওয়া, ছোট মাছ যেমন- জাটকা ও রেণু ধরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাই মৎস্য সম্পদের উন্নতির জন্য বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

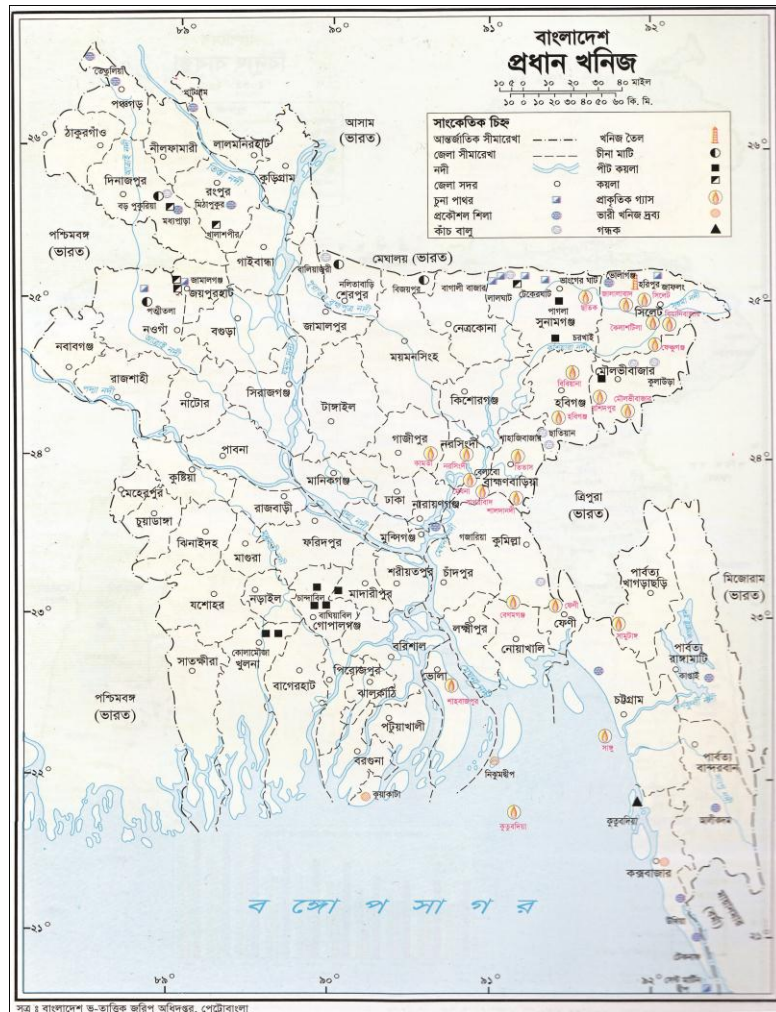
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাৎস্য সম্পদের গুরুত্ব

মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ। দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের মাছ ও মাছ জাতীয় সম্পদে পরিপূর্ণ। দেশের শতকরা ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য সম্পদ আহরণ, বাজারজাতকরণ ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। দেশের জিডিপির ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান ৩.৬১% (বিবিএস ইকনমিক রিভিউ ২০১৭) এবং মোট কৃষিজ উৎপাদনের ২৪.৪৩% ভাগ ছিল মৎস্য সম্পদ। (বিবিএস ইকনমিক রিভিউ ২০১৭) রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান শতকরা প্রায়

৫.১২ ভাগ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ হতে প্রচুর মৎস্য বিদেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি ও ইলিশ প্রধান। বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়, তার শতকরা ৬৫ ভাগ হলো চিংড়ি। তাই চিংড়ি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

খনিজ সম্পদ

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, পিট কয়লা, চূনাপাথর, সিলিকা বালি, চীনা মাটি, কঠিন শিলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এসব খনিজ সম্পদের বর্ণনা দেওয়া হলো।



চিত্র: মানচিত্রে খনিজ সম্পদের অবস্থান

ক) প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম সিলেটে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এপর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৩টি। এর অধিকাংশই বৃহত্তর সিলেট জেলায় অবস্থিত। এদেশের বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রে প্রায় ২৩ হাজার বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সংরক্ষিত আছে, তার

মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার বিলিয়ন ঘনফুট। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গ্যাস সম্পদ ব্যাপক অবদান রাখছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসই দেশের প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধান উৎস (রহমান, ২০১০:২৯০)।

খ) খনিজ তেল : পেট্রোলিয়ামের তরল অবস্থা হলো খনিজ তেল। ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রথম তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়। ২০২০ থেকে ২০৩০ মিটার গভীরতায় প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এখানে মজুদ আছে, তবে উত্তোলনযোগ্য তেলের পরিমাণ প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল (রহমান, ২০১০:২৯২)। এছাড়াও সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ, কৈলাসটিলা এবং বরমচালে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

গ) কয়লা : বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে ততটা সমৃদ্ধ নয়। জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালাসপীর এবং পীরগঞ্জ, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া এবং দিঘিপাড়া, বগুড়া জেলার কুচমা এবং নওগাঁ জেলার শিবগঞ্জে কয়লা খনি রয়েছে। জামালগঞ্জ কয়লাখনিতে ১০৫ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা, খালাসপীর কয়লাখনিতে ৬৮ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা সঞ্চিত রয়েছে (চৌধুরী, ২০১১:২৫০)। উপর্যুক্ত কয়লা খনি ছাড়া গোপালগঞ্জ, খুলনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। গোপালগঞ্জ জেলার বাঘিয়া ও চান্দার বিলে প্রায় ১২ কোটি টন, খুলনা জেলার কোলা বিলে ৮০ লক্ষ টন এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারে প্রায় ৯১ লক্ষ টন কয়লা সঞ্চিত আছে (চৌধুরী, ২০১১:২৫০)।

ঘ) চুনা পাথর : বাংলাদেশে প্রচুর চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরঘাট, লালঘাট ও বগলিবাজার; সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ; জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ; চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড; কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর সিমেন্ট, গ্লাস, ইস্পাত, সাবান, কাগজ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঙ) সিলিকা : এটি একধরনের বালু যা কাঁচ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য, রং, অগ্নিচুল্লির ইষ্টক নির্মাণে এর দরকার হয়। বাংলাদেশের শেরপুর জেলার বালিজুরি, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া, হবিগঞ্জ জেলার শাহজীবাজার ও নয়াপাড়া, সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরঘাট, কুমিল্লা জেলার বাতাসিয়া ও দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে সিলিকা বালু পাওয়া যায়।

চ) চীনামাটি : বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুর গ্রামে, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে চীনামাটি পাওয়া যায়। বাসনপত্র, কাগজ, রবার, বস্ত্র, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, স্যানিটারি জিনিসপত্র প্রভৃতি নির্মাণে চীনামাটি ব্যবহৃত হয়।

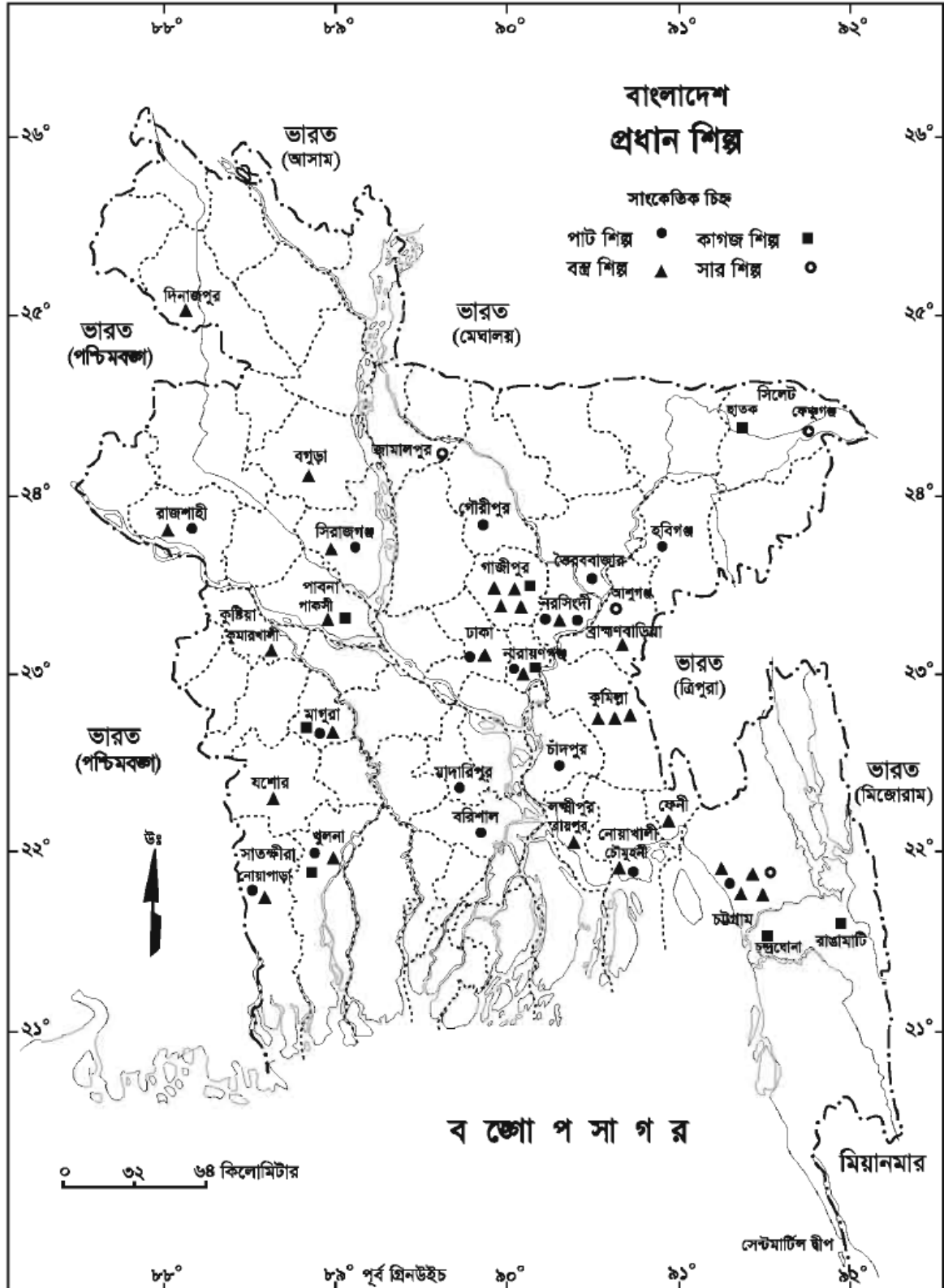
ছ) কঠিন শিলা : বাংলাদেশের রংপুর জেলার রানীপুকুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থানে কঠিন শিলা পাওয়া যায়। রেললাইন, রাস্তাঘাট, গৃহ নির্মাণ, নদীর বাঁধ তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কঠিন শিলার প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের উন্নয়নের মূলে রয়েছে খনিজ সম্পদের অবদান। যে কোনো দেশের শিল্পায়ন খনিজ সম্পদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। খনিজ সম্পদ শিল্পক্ষেত্রে একাধারে ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল ও জ্বালানি উভয়ই সরবরাহ করে শিল্পের সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে (মারুফা, ২০১০:৪৮২)। প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের শিল্পের বিকাশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। ফলে জ্বালানি খাতে আমদানি ব্যয় সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ৭টি ইউরিয়া সার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বড়পুকুরিয়ার কয়লাখনি থেকে উত্তোলিত কয়লার ওপর ভিত্তি করে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সিমেন্ট, কাগজ, কয়লা, চা, সিরামিক প্রক্রিয়াজাতকরণসহ দেশের বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি ও অন্যান্য প্রয়োজনে কয়লা, গ্যাস, খনিজ তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কঠিন শিলা, নুড়িপাথর প্রভৃতি রাস্তাঘাট, পুল ও রেলপথ নির্মাণে ব্যবহার করা হয় (রহমান, ২০১০:২৯৬)। বাংলাদেশে খনিজ সম্পদে ততটা সমৃদ্ধ না হলেও প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই সরকারকে খনিজ সম্পদের উত্তোলন এবং ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিল্প

বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প হলো পোশাক শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে পাট, চিনি, সার, সিমেন্ট, কাগজ, দিয়াশলাই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া লোহা ও ইস্পাত শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, চামড়া, চা, কাঁচ, ওষুধ, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, রাসায়নিক এবং বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্প রয়েছে। দেশের অধিকাংশ শিল্প-কারখানা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত। কাঁচামাল, শ্রমের সহজলভ্যতা ও বাজার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কিছু কিছু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন হস্ত ও কুটির শিল্প রয়েছে।



মানচিত্র: বাংলাদেশের প্রধান শিল্প

বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চল ও এর অবদান

বাংলাদেশে প্রধান প্রধান শিল্পের অবস্থান এবং এগুলোর অবদান নিচের ছকে দেখানো হলো—

শিল্প	অঞ্চল
পাট	১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম আদমজী পাটকল নির্মিত হয়। তবে বর্তমানে বিজেএমসির পাটকল সংখ্যা ২৭টি। বাংলাদেশের পাটশিল্পের প্রধান প্রধান অঞ্চল হলো : নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকা। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশে ১২২.০৯ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রায় ৩২ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার অর্জন করে (চৌধুরী, ২০১১:২৮২)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয়করে ১০২৫.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। (সূত্র: ইপিবি)
চিনি	১৯৩৩-৩৯ সালের মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ৫টি চিনি কল গড়ে ওঠে। এ গুলো হলো : উত্তরবঙ্গ চিনির কল, দেশবন্ধু চিনির কল, সেতাবগঞ্জ চিনির কল, কেরাঅ্যান্ড কোম্পানি ও ন্যাশানাল চিনি কল। বর্তমানে এদেশে ১৮টি চিনির কল রয়েছে। তবে এখনও দেশ চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।
চা	বর্তমানে দেশে ১৫৬টি চা বাগান রয়েছে। অধিকাংশ চা বাগান সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে অবস্থিত। তাছাড়া চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও পঞ্চগড়ে চা বাগান রয়েছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশে চা রপ্তানি করে ৪৪ লক্ষ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার অর্জন করে (সূত্র: ইপিবি)।
সার	বর্তমানে ৯টি সার কারখানা রয়েছে। সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ, নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীতে সার কারখানা গড়ে উঠেছে। তবে সার উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।
সিমেন্ট	দেশে বর্তমানে ১২টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও মংলায় সিমেন্টশিল্প গড়ে উঠেছে। বর্তমানে চাহিদার অর্ধেক সিমেন্ট দেশে উৎপন্ন হয়।
কাগজ	২২টি কাগজ ও বোর্ড কল রয়েছে। বাংলাদেশের কাগজ শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলো হলো-ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা ও ছাতক। এর পরেও দেশ কাগজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।
চামড়া	ছোট-বড় মিলিয়ে ২৪৮টিরও অধিক চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে। এর অধিকাংশই ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চামড়া খাত

শিল্প	অঞ্চল
	থেকে পাওয়া যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয় ১০৮৫.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
পোশাক	বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় ৩৫০০-এর বেশি গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরি রয়েছে। প্রায় ১৬ লক্ষ নারী-পুরুষ এখানে কাজ করে, তার মধ্যে ৭০%-এরও বেশি নারী শ্রমিক। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাতের আয় ছিল ২ হাজার ৮১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার যা মোট রপ্তানী আয়ের ৮১.২৩ শতাংশ।

বাংলাদেশের শিল্প, কাঁচামালের উৎস ও শিল্পজাত দ্রব্য

শিল্পকারখানাসমূহে কাঁচামাল হিসেবে সাধারণত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে সেগুলো হলো পাট শিল্প, চা শিল্প, চামড়া শিল্প, কাগজ শিল্প, বিভিন্ন কুটির শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঁচ শিল্প ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু শিল্পে বাংলাদেশের কাঁচামালসহ বিদেশ থেকে আনা কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। আবার এমন কিছু শিল্প আছে যা বিদেশি কাঁচামালের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যেমন-লোহা ও ইস্পাত শিল্প।

বাংলাদেশে কোন কোন শিল্পে কী কী কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় এবং তা থেকে কী ধরনের দ্রব্য পাওয়া যায় তা একটি তালিকায় দেখানো হলো-

ডশিল্প	কাঁচামাল	শিল্পজাত দ্রব্য
১. পোশাক শিল্প	ধানবস্ত্র ও উল প্রধানত বাইরে থেকে আসে	বিভিন্ন ধরনের পোশাক ও শীতবস্ত্র
২. সার শিল্প	প্রাকৃতিক গ্যাস	রাসায়নিক সার
৩. সিমেন্ট শিল্প	চুনাপাথর, কাদা, ক্লিন্কার, ডলোমাইট ইত্যাদি	সিমেন্ট
৪. কাগজ শিল্প	বাঁশ, আখের ছোবড়া, খড়, কাঠ, পাটকাঠি ইত্যাদি	নিউজপ্রিন্ট, বিভিন্ন ধরনের লেখা ও ছাপার কাগজ
৫. দিয়াশলাই শিল্প	নরম কাঠ	দিয়াশলাই
৬. চিনি শিল্প	আখ	চিনি
৭. পাট শিল্প	পাট	পাটজাত দ্রব্য (চট, বস্তা, পাটের সুতা, কাপড়, কার্পেট, দড়ি ইত্যাদি)

ডশল্ল	কাঁচামাল	শিল্পজাত দ্রব্য
৮. চা	চা পাতা	চা
৯. লোহা ও ইস্পাত শিল্প	লোহা	লোহা নির্মিত বিভিন্ন দ্রব্য
১০. চামড়া শিল্প	চামড়া	জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি
১১. কাঁচ শিল্প	সিলিকা বালি, লবণ, চুনাপাথর ইত্যাদি	খালাবাসন, দরজা জানালার কাচ, শৌখিন দ্রব্যাদি
১২. খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প	খাদ্যশস্য ও ফলমূল	বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য
১৩. চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত শিল্প	চিংড়ি	হিমায়িত চিংড়ি
১৪. বিভিন্ন কুটির শিল্প	তাঁত শিল্পের জন্য সুতা, রেশম শিল্পের জন্য রেশম সুতা এবং সুতি বস্ত্র শিল্পের জন্য তুলা, কাঠ শিল্পে কাঠ, বাঁশ নির্ভর কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বাঁশ।	সুতি ও রেশম বস্ত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক যুগে কোনো দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধু কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে না। উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বিবেচনা করলে দেখা যায় তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে দ্রুত শিল্পায়ন। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য শিল্পের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ নিম্নমধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবার পেছনেও এদেশে উদীয়মান শিল্পের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য সার ও কীটনাশক উৎপাদন, বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পোশাক শিল্পে বহু মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হলো পোশাকশিল্প। এছাড়াও পাট, চা ও হিমায়িতচিংড়ি রপ্তানি করে।

সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্প স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আমদানি ও রপ্তানি পণ্য বাণিজ্য

পৃথিবীর কোনো দেশই প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন ও পরিসরের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে উদ্ভূত এবং ঘাটতি পূরণের জন্য আমদানি-রপ্তানির প্রয়োজন হয়। কোনো দেশে কোনো দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন না হলে বা ঘাটতি থাকলে তা বিদেশ থেকে আনা হয়। এ ধরনের পণ্যকে আমদানি পণ্য বলে। অন্যদিকে কোন দেশ তার প্রয়োজনের তুলনায় অধিক দ্রব্য বাণিজ্যিক কারণে উৎপাদন করে অন্য দেশের নিকট বিক্রি করলে সে পণ্যকে রপ্তানি পণ্য বলে। বাংলাদেশ প্রধানত আমদানিনির্ভর দেশ।

বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক এবং চিংড়ি মাছ প্রধান। এর পর রয়েছে চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, কুটির শিল্পের শৌখিন দ্রব্য, তামাক, ওষুধ ইত্যাদি। বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। পক্ষান্তরে, আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্যশস্য, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য, ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত, জ্বালানি, গাড়ি, ওষুধ, কসমেটিক্স, কাপড়, শিশুদের খেলনা ইত্যাদি। বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে থাকে তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, জাপান, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য। আমদানির পরিমাণ রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা বেশি বলে প্রতি বছর বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থান

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে রয়েছে অনেক সুন্দর এবং ঐতিহাসিক স্থান, যা পর্যটকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। এগুলোও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এখানে এ রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বর্ণনা করা হলো।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত: কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ সমুদ্র সৈকতটি অবস্থিত। সমুদ্রতীরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি ও সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছের সহজলভ্যতা কক্সবাজারকে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের জনপ্রিয় স্থানগুলো হলো : লাবনী সৈকত, হিমছড়ি, ইনানি সৈকত ও সুগন্ধা সৈকত।



চিত্র: কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

লাবনী হলো কক্সবাজারের প্রধান সমুদ্র সৈকত। হিমছড়ি সৈকত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। হিমছড়ি সৈকতের একদিকে রয়েছে সবুজ পাহাড় আর অন্যদিকে রয়েছে বিশাল সমুদ্র। পাহাড়ের চূড়ায় বসে সমুদ্র দেখার মজাটাই আলাদা। তদুপরি এখানে রয়েছে একটি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক ঝরনা। হিমছড়ি পাহাড়ি ঝরনা জন্য বিখ্যাত। ইনানী সৈকত হিমছড়ি সৈকতের দক্ষিণে অবস্থিত। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে এটির দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার। এটি সোনালি বালু এবং পরিষ্কার পানির জন্য বিখ্যাত। তাছাড়া এখানে রয়েছে অনেক কোরাল পাথর যা একে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের সাথে এ স্থানটির মিল পাওয়া যায়। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের নিকটে সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে মহেশখালী দ্বীপ, যেটি প্রাকৃতিক বন আর আদিনাথ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত টেকনাফ থেকে অদূরে সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত কোরাল আইল্যান্ড ‘সেন্টমার্টিন’।

রাঙামাটি

চট্টগ্রাম শহর থেকে সড়কপথে ৭৭ কিলোমিটার দূরে রাঙামাটি অবস্থিত। পুরো এলাকাটি সবুজপাহাড়ে ঘেরা। এ শহরটি কাগুই হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রাঙামাটি পাহাড়, বন ও লেকে ঘেরা একটি অত্যন্ত চমৎকার জায়গা ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অবকাশ কেন্দ্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ স্থানটিতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও প্রাণী রয়েছে। এখানে রয়েছে একটি চমৎকার ঝুলন্ত ব্রিজ। রাঙামাটি চাকমা, মারমাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাসস্থান।



চিত্র: রাঙ্গামাটি কাপ্তাই লেকে ঝুলন্ত সেতু

এখানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার একটি জাদুঘর রয়েছে। এখানে বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকদের হাতে বানানো নানা ধরনের পোশাক ও হাতির দাঁতের গহনা পাওয়া যায়। এখানকার জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, হৃদের পানিতে মাছ ধরা ও স্পিড বোটে ঘুরে বেড়ানো, গোসল ও স্কি করা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রাঙ্গামাটি শহর থেকে খানিকটা দূরে পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক বারনায় শোভিত শুভলং এর সৌন্দর্য অবর্ণনীয়।

সেন্টমার্টিন

এটি বঙ্গোপসাগরের একটি ছোট দ্বীপ। টেকনাফ থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। এর চারদিক ঘিরে আছে বঙ্গোপসাগর। এ দ্বীপটির স্থানীয় নাম নারিকেল জিজিরা। এর অর্থ নারিকেলের দ্বীপ। এখানে আছে প্রচুর নারিকেল ও তাল গাছের সমারোহ। এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ।



চিত্র: সেন্টমার্টিন

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর পেশা মাছ ধরা ও মাছ শুটকি করে বিক্রি করা। প্রধান শস্য ধান এবং নারিকেল। এখানে আরো আছে স্বচ্ছ নীল পানির সমুদ্র তীর ইত্যাদি। বর্তমানে সেন্টমার্টিন একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

কুয়াকাটা

কুয়াকাটা বাংলাদেশের আরেকটি অপূর্ব সুন্দর সমুদ্র সৈকত। বাংলাদেশের দক্ষিণে পটুয়াখালী জেলায় বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে এটি অবস্থিত। এটি ঢাকা থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার প্রধান অধিবাসীদের নাম রাখাইন। বলা হয়ে থাকে কয়েকশ' বছর আগে রাখাইনরা মিষ্টি পানির জন্য এখানে কুয়া খনন করেছিল। সে থেকে এর নাম হয়েছে কুয়াকাটা। কুয়াকাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনন্য, এটি বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র সৈকত যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। এখানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত, যেটি ১০০ বছরের পুরানো। এ মন্দিরে অবস্থিত বুদ্ধের মূর্তিটিও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তি।



চিত্র: কুয়াকাটা

এছাড়া কুয়াকাটার সমুদ্র তীরে ২০০ বছরের পুরানো দুটি কুয়া আছে। শীতে এখানে প্রচুর অতিথি পাখি আসে। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে কুয়াকাটাকে বলা হয় ‘সাগর কন্যা’।

সুন্দরবন

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম বনভূমি। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এখানকার একটি প্রধান উদ্ভিদ ‘সুন্দরী বৃক্ষ’। এ জন্য এ বনভূমির নাম হয়েছে সুন্দরবন। এছাড়াও এখানে আছে আরো নানা ধরনের গাছের সমারোহ। সুন্দরবন পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল। এছাড়া আছে বিভিন্ন ধরনের হরিণ, পাখি, সাপ, কুমির, বনবিড়াল, লেপার্ড, সজারু, বন্যশূকর ইত্যাদি।

এখানকার চিত্রা হরিণ দেখতে খুব সুন্দর। বনের মাঝে দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য খাল ও ছোট ছোট নদী। এসব খালে বাস করে কুমিরসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী। এ বনভূমি থেকে প্রচুর কাঠ, মধু, মোম ও মাছ পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারণে এ বনভূমির গুরুত্ব অনেক বেশি। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলকে বাড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে।



চিত্র: সুন্দরবন

সুন্দরবন বিশ্বের একটি অনন্যসুন্দর প্রাকৃতিক নিদর্শন। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে একে একটি ‘বিশ্বঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

বান্দরবান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত একটি পাহাড়ি জেলা। এটি বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম সুন্দর স্থান। বান্দরবান শব্দটির অর্থ হলো বানরের বাঁধ। বান্দরবান পাহাড়, পাহাড়ি বন ও সমভূমিতে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি। এখানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ি চূড়া অবস্থিত, যার নাম তাজিংডং (উচ্চতা প্রায় ১২৩১ মিটার)।



চিত্র: বান্দরবান

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কেওক্লাডং ও (উচ্চতা ১২৩০ মিটার) এইখানে অবস্থিত। চিম্বুক পাহাড়ের চূড়া, নীলগিরি এবং বগা লেক বান্দরবান জেলার উল্লেখযোগ্য স্থান।



চিত্র: বান্দরবান (নীলগিরি)

এখানে আছে সুউচ্চ পাহাড়ি চূড়া, পাহাড়ি জলাভূমি, লেক, পাহাড়ি ঝরনা। সমগ্র পাহাড় জুড়ে রয়েছে নয়নাভিরাম সবুজ বনভূমি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দির এখানে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির। এখানে বুদ্ধের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্তি রয়েছে। এছাড়া সারা শহর জুড়ে আছে অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির। এদেরকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় কিয়াং। বান্দরবানের মিলানছড়িতে একটি পাহাড়ি ঝরনা আছে। এর নাম শৈলপ্রপাত। এটি একটি অন্যতম সুন্দর জায়গা।

জাফলং

জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। এটি সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানায় খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে ভারতের খাসিয়া পাহাড় থেকে মারী নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ নদীর পানিতে বয়ে আসে অনেক পাহাড়ি পাথর।



চিত্র: জাফলং

তাই পাথর উত্তোলন এখানকার অধিবাসীদের একটি প্রধান জীবিকা। জাফলং খাসিয়া জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল। জাফলং পুরোটাই পাহাড়ে ঘেরা এক অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এ পাহাড় সবুজ বনে ঢাকা। এসব বনে রয়েছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। জাফলং-এর অতি নিকটে রয়েছে তামাবিল স্থল বন্দর। এটিও ভ্রমণের জন্য একটি চমৎকার জায়গা।

রাতারগুল জলজবন

রাতারগুল বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির জলজবন বা সোয়াম্প ফরেস্ট। এটি সিলেটের গোয়াইনঘাটে অবস্থিত। বনের আয়তন ৩,৩২৫.৬১ একর, আর এর মধ্যে ৫০৪ একর বনকে ১৯৭৩ সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এটি পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি



চিত্র: রাতারগুল জলজবন

জলজবনের মধ্যে অন্যতম একটি। চিরসবুজ এই বনকে বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগের অধীনে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই বন গোয়াইন নদীর তীরে অবস্থিত এবং চেঙ্গির খালের সাথে একে সংযুক্ত করেছে। এখানে সবচেয়ে বেশি জন্মায় করচ গাছ (বৈজ্ঞানিক নাম- *Millettia pinnata*)। বর্ষাকালে এই বন ২০ থেকে ৩০ ফুট পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। বাকি সারা বছর, পানির উচ্চতা ১০ ফুটের মতো থাকে।

বিছানাকান্দি

বিছানাকান্দি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার রুস্তমপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে অবস্থিত। এটি বন ও পাহাড়ের নজরকাড়া সৌন্দর্যের মাঝে অপরূপ লীলাভূমি। বর্ষাকালে এখানে ঝরনার পাশাপাশি কালো মেঘ পাহাড়গুলোকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পাহাড়ি ঢলের সাথে বয়ে আসা বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড বিছানাকান্দিতে এসে পড়ে।



চিত্র: বিছানাকান্দি

উপরে উল্লেখিত স্থানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। এগুলো আমাদের সম্পদ, ঐতিহ্য ও গৌরব। এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্বও আমাদের। তাই এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।

অধ্যায় ১০

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মতো বাংলাদেশের আছে বিভিন্ন জাতীয় প্রতীক। এগুলো জাতীয় ঐতিহ্য ও সংহতির প্রতীক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে আমরা এসব অর্জন করেছি। জাতীয় প্রতীকগুলো একদিকে বিশ্ব দরবারে নিজের দেশের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্বকে প্রকাশ করে ও দেশকে মর্যাদার সাথে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে নাগরিকদের দেশপ্রেম, জাতীয় আদর্শ ও সংহতিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আমাদের সবার জাতীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা উচিত।

সংবিধান

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান পাস হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকরী হয়। এটি আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এ চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।



বাংলাদেশের সংবিধান

জাতীয় মনোগ্রাম

লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের উপরে লেখা ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ এবং নিচে লেখা ‘সরকার’। বৃত্তের দুই পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা আছে। চারটি তারকা রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রকাশ করে। সরকারি কাজকর্মে এ মনোগ্রাম ব্যবহৃত হয়।



জাতীয় মনোগ্রাম

রাষ্ট্রীয় প্রতীক

পানিতে ভাসমান শাপলার দু'পাশে দুটি ধানের শিষ। শাপলার উপরে তিনটি সংযুক্ত পাট পাতা আছে। পাতাগুলোর দুপাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা আছে। চারটি তারকা রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রকাশ করে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এটি ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের রূপকার শিল্পী কামরুল হাসান।



রাষ্ট্রীয় প্রতীক

জাতীয় পতাকা

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং সবুজ। মাঝে গাঢ় লাল বৃত্ত। লাল রঙের বৃত্তটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার নতুন সূর্যের প্রতীক। উজ্জ্বল ঘন সবুজ অংশটি বিস্তৃত গ্রামবাংলার সবুজ পরিবেশ ও তারণ্যের প্রতীক। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত যেকোনো দিবসে এটি উত্তোলন



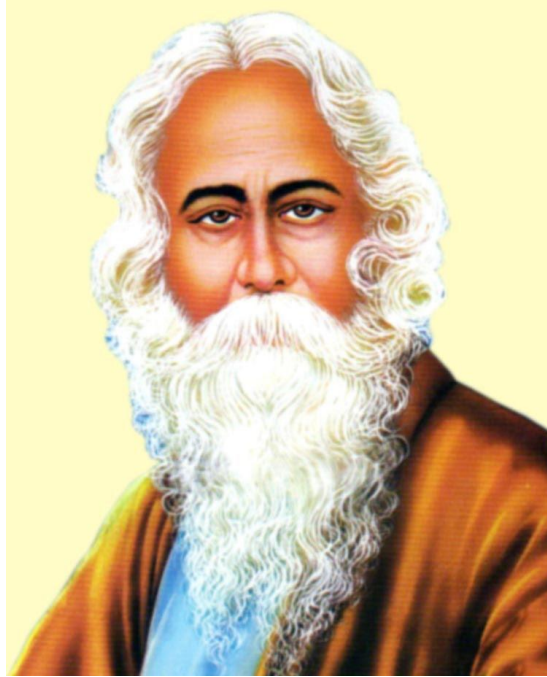
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

করা হয়। জাতীয় শোক দিবস, রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত কোনো শোকের দিনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। পতাকা দণ্ডের উপরের প্রান্তে পতাকার যতটুকু প্রস্থ (ধরি-২ ফুট) ততটুকু বাদ রেখে পতাকা টানানোই হলো পতাকা অর্ধনমিত রাখা। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার শিল্পী কামরুল হাসান।

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ।।
ওমা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ওমা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি ।।
কী শোভা, কী ছায়াগো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদন খানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়ন জলে ভাসি ।।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা । ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাঁর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' কবিতা থেকে প্রথম ১০ লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে নেওয়া হয়েছে ।



চিত্র: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত পল্টন ময়দানের জনসভায় এটি আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয় । ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এ গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয় । কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এর প্রথম চার লাইন বাজানো হয় । প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সমাবেশে শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংগীত

গাওয়ার মাধ্যমে দিনের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া যেকোনো অনুষ্ঠানেও এটি বাজানো হয়। জাতীয় সংগীত যখন গাওয়া বা বাজানো হয় তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

জাতীয় পাখি

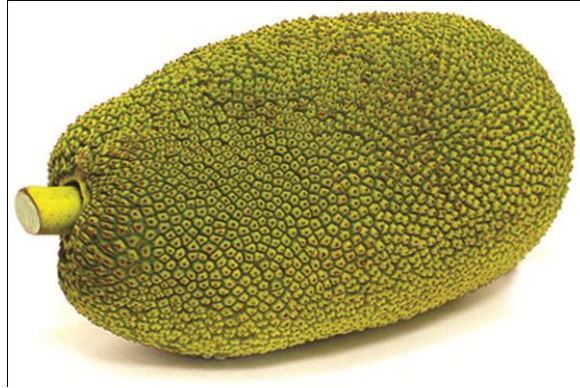
দোয়েল বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। দোয়েল মিষ্টি কণ্ঠে শিস দেয়। এটি দেখতে কালো। তবে লেজ, পাখা ও পায়ের ওপরের অংশে সাদা রঙের পালক আছে। দোয়েল পাখির আকার মাঝারি। বাংলাদেশের সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এটি পাওয়া যায়।



জাতীয় ফল

চিত্র: দোয়েল, বাংলাদেশের জাতীয় পাখি

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এটি আকারে বেশ বড় হয়। এর বহির্ভাগ কাঁটায় ভরা। ভিতরের অংশ হলুদ রঙের। ফলটি রসালো এবং সুস্বাদু। কাঁচা কাঁঠাল তরকারি হিসেবেও খাওয়া হয়। এর বীচি উপাদেয় খাবার। কাঁঠালের উচ্ছিষ্ট অংশ ও খোসা গরুর প্রিয় খাদ্য। বাংলাদেশের সব জায়গায় কম-বেশি কাঁঠাল জন্মে। তবে গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে বেশি কাঁঠাল জন্মে।



চিত্র: কাঁঠাল, বাংলাদেশের জাতীয় ফল

জাতীয় ফুল

পানিতে ভাসমান সাদা রঙের শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। ফুলটি দেখতে খুব সুন্দর। এর অনেকগুলো পাপড়ি থাকে। বাংলাদেশের খালবিল, পুকুর তথা যেকোনো বদ্ধ পানিতে শাপলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শাপলা ফুলের ডাঁটা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: শাপলা, বাংলাদেশের জাতীয় ফুল

জাতীয় কবি

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬, ১১ জ্যৈষ্ঠ) ভারতের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত 'চল চল চল' সংগীতটি আমাদের রণ সংগীত। কাজী নজরুল ইসলাম একজন বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত বিদ্রোহী কবিতা ও গান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে।



চিত্র: কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের জাতীয় কবি

জাতীয় মাছ

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। সমুদ্রে বাস হলেও পূর্ণ বয়স্ক ইলিশ ডিম পাড়ার মৌসুমে ঝাঁক বেঁধে মোহনা অতিক্রম করে নদীর উজানে এসে ডিম পাড়ে। মিষ্টি পানিতে জন্ম নেয়া পোনা ইলিশকে বলা হয় জাটকা। এরা আবারও নদীর ভাটির পথ ধরে সমুদ্রে পৌঁছে যায়। ইলিশ খুব সুস্বাদু মাছ। রুপালি রঙের ইলিশের দেশে-বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে। প্রতি বছর এই মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও ইলিশ খুব উল্লেখযোগ্য একটি মাছ। পদ্মা নদীর মোহনায় ও সমুদ্রে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে। সারা বছরই ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। তবে বর্ষাকালে মাছটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।



চিত্র: ইলিশ, বাংলাদেশের জাতীয় মাছ

জাতীয় পশু

রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন এর আবাসস্থল। হলুদের মাঝে কালো ডোরা কাটা বাঘ আকারে অনেক বড় ও হিংস্র। সুন্দরবনের বাঘের রাজকীয় ভাবভঙ্গি ও জৌলুস দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়। একমাত্র সিংহ ছাড়া এর সঙ্গে কোনো পশুর তুলনা চলে না। এজন্য সাহেবরা এর নাম দিয়েছেন ‘রয়েল বেঙ্গল টাইগার’। সুন্দরবন পরিবেশগত হুমকির মুখে পড়ার কারণে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে।



চিত্র: রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বাংলাদেশের জাতীয় পশু

জাতীয় বৃক্ষ

আমাদের জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ। দেশের সব অঞ্চলেই আম গাছ জন্মে। তবে সবচেয়ে ভালো ও উন্নত জাতের গাছ হয় রাজশাহীতে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব বাড়িতেই আম গাছ আছে। আম খেতে খুব সুস্বাদু।



চিত্র: আম গাছ, বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ

জাতীয় খেলা

কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। এর আরেক নাম হা-ডু-ডু। এটি গ্রামবাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী খেলা। দশজনের দুটি দলে এটি খেলা হয়। একজন রেফারি খেলা পরিচালনা করেন। এই খেলায় শরীর মজবুত ও বলিষ্ঠ হয় এবং শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ অর্জন করা যায়। সাফ গেমসে এ খেলা স্থান পেয়েছে।



চিত্র: জাতীয় খেলা কাবাডি বা হা-ডু-ডু

জাতীয় মসজিদ

ঢাকায় অবস্থিত বায়তুল মোকাররম মসজিদ আমাদের জাতীয় মসজিদ। ১৯৬০ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। সর্বপ্রথম নামাজ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ২৫ জানুয়ারি। মসজিদটি আটতলা বিশিষ্ট। তবে মসজিদ হিসেবে উক্ত আটতলার মধ্য হতে ছয়টি তলা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



চিত্র: জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

ঢাকার সাভারের নবীনগরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। জাতীয় স্মৃতিসৌধের রূপকার সৈয়দ মাইনুল হোসেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের স্মরণে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই প্রতি বছর স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে এখানে ফুল প্রদানের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। এর উচ্চতা ১৫০ ফুট। এতে সাতটি ফলক আছে, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি পর্যায়কে নির্দেশ করে। যথা-১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুজ্জফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬-এর শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন,



চিত্র: জাতীয় স্মৃতিসৌধ

১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। এটি পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। বিদেশ থেকে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথিবৃন্দও এখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

স্বাধীনতা দিবস

২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ চালায়। এক রাতের মধ্যে তারা ঢাকা শহরকে বধ্যভূমি ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঐ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার পূর্ব মুহূর্তে

অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং বাংলাদেশের জাতীয় দিবস।

বিজয় দিবস

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা। তাই প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর ‘মহান বিজয় দিবস’ পালন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস

বাঙালি জাতির জীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মুক্তির প্রতীক, সকল প্রেরণার উৎস। বাংলাদেশ ও বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। অথচ সেনাবাহিনীর বিপথগামী কিছু সামরিক অফিসার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে। এজন্য এই দিনটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ‘কালো দিবস’ হিসেবে গণ্য করা হয়। সমগ্র জাতি এই দিনটিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শোক পালন করে। তাই ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস।

শহিদ দিবস

১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালন করা হয়। এদিন বাঙালি খালি পায়ে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানায়। আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত ও আলতাফ মাহমুদের সুরারোপিত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানটি গাইতে গাইতে সবাই প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করে। ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মিত হয়। জাতীয় শহিদ মিনারের রূপকার শিল্পী হামিদুর রহমান। ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সে জন্য জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ ঘোষণা করেছে। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো যথাযথ মর্যাদায় এ দিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে।



চিত্র: শহিদ মিনার

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

১৪ ডিসেম্বর আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে বাঙালিকে মেধাশূন্য করার জন্য এদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর সহায়তায় এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের তালিকা বানিয়ে হত্যা করে। এদের অনেকের লাশ রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়।

জাতীয় উদ্যান

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে আমাদের জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। পূর্বে এর নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সাক্ষী। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। আবার এখানেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে



আত্মসমর্পণ করেছিল। আমাদের জাতীয় প্রতীকগুলো রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার। তাই শিশুকাল থেকে এগুলোর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও যথাযথভাবে পরিচিতকরণ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

অধ্যায় ১১

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

বাংলাদেশের সংস্কৃতি

বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতির পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস এ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে করেছে সমৃদ্ধ। সে জন্য এ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বহুমাত্রিক সংস্কৃতি (ভান সেন্দেল, ১৯৯৮) বলা হয়। মুসলিম, হিন্দু, বৈষ্ণব, বাউল, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, আচার-রীতি, প্রথা ইত্যাদি সবই বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। এ সমস্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হাজার হাজার বছরের পুরাতন। নিচে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বর্ণনা দেয়া হলো।

ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত

বাংলা ভাষা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা। এ ভাষার সাধু ও চলিত দুটি রূপ রয়েছে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ভাষা সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়েছে। দশম থেকে দ্বাদশ শতকে লিখিত ‘চর্যাপদ’ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরাতন সাহিত্য নিদর্শন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এই ভাষায় গীতিপদাবলি রচনা করেছিলেন। চর্যাপদের গীতিপদাবলি বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে খুবই মূল্যবান। এই পদাবলির মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রাচীন বাংলার ভাষা ও তার ঠিক পূর্বের ভাষার নমুনা পাওয়া যায় তেমনি জানা যায় প্রাচীন বাংলার মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও জীবন চিত্র। প্রাচীনকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাহিত্যকর্ম সংযোজিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব সাহিত্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পনের শতকের শেষ দিকে ‘মঙ্গলকাব্য’ বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছে। এর পাশাপাশি মধ্যযুগে লোকসাহিত্যের প্রসার ঘটে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার লাভ করে। এক্ষেত্রে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ মৌলিক অবদান রেখেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো সঙ্গীত, যা বাংলা সংস্কৃতিকে করেছে ঐশ্বর্যবান। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া বাংলার লোকসঙ্গীত যেমন-বাউল গান, জারি গান, সারি গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, গভীরা, কবিগান, পালাগান, কীর্তনগান-সবকিছুই বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কুষ্টিয়া অঞ্চলে বাউল সঙ্গীত, দক্ষিণ অঞ্চলে ভাটিয়ালি, উত্তর অঞ্চলে ভাওয়াইয়া বা ময়মনসিংহ অঞ্চলে ময়মনসিংহ গীতিকার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে।

বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাহিত্যচর্চা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। চাকমা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন ‘রাধামন ধনপুদি পালা’, ‘চাদিগাং ছারা পালা’ ও ‘লক্ষ্মী পালা’। মধ্যযুগে ‘সাদেংগিরির উপাখ্যান’, ‘গোবোন লামা’ ও ‘বারমাসী’ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে সুগত চাকমার ‘রাঙামাত্যা’, দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমার ‘পাদারঙ কোচপানা’ ও সুহৃদ চাকমার ‘বাগী’ অন্যতম (বাংলাদেশ সরকার, ২০১১)।

বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যকলা

বাঙালি সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাচীন বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠী লোকসঙ্গীতের সাথে বিভিন্ন লোকজ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করত। এর মধ্যে একতারা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি অন্যতম। আধুনিক বাংলা সঙ্গীতে হারমোনিয়ামের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। উচ্চ সমাজে সেতার, সুরবাহার, সরোদ, বেহালা ব্যবহার অনেক বেশি লক্ষণীয় (মুরশিদ, ২০১০)।



চিত্র: বাদ্যযন্ত্র



চিত্র: নৃত্যকলা

অতি প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশে নানা ধরনের নৃত্যকলার প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন লোকজ ও শাস্ত্রীয় নৃত্য আবহমান গ্রামবাংলার মানুষের আশা-অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ। মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত পোড়ামাটির ফলক আছে তা থেকে এটা বুঝা যায় যে নাচ অনেক আগে হতেই এ দেশে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরি ও কথক নাচকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন (মুরশিদ, ২০১০)। বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাইরেও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্য বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতি হতে ভিন্ন। চাকমাদের জনপ্রিয় নৃত্য হচ্ছে ‘জুমনৃত্য’। ‘গরাইয়া নৃত্য’ ত্রিপুরাদের প্রিয় নৃত্য। বৈসুক উৎসবে এটির বিশেষ আয়োজন করা হয়। লুসাই, বম ও পাঞ্জা সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘বাঁশ নৃত্য’ ব্যাপক জনপ্রিয়।

ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব

বাংলাদেশে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এখানে অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী গোষ্ঠী যেমন-হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব হলো ‘ঈদ-উল-ফিতর’ ও ‘ঈদ-উল-আজহা’। হিন্দু সম্প্রদায় ‘দুর্গাপূজা’ প্রধান উৎসব হিসেবে পালন করে। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় যথাক্রমে বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং ‘বড়দিন’ প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালন করে। এসব উৎসবে একে অপরের উপস্থিতি এ দেশের সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা করেছে। এ কারণে সমাজজীবনে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে।



চিত্র : বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

সামাজিক উৎসব হিসেবে বাঙালি জনগোষ্ঠী বাংলা ‘নববর্ষ’ উদযাপন করে। বাংলা সনের প্রথম তারিখে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ নববর্ষ পালন করা হয়। এটি বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। পুরাতনকে বিদায় করে নতুনকে নানা উৎসবের মাধ্যমে বরণ করে নেয়া হয়। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এ উৎসবে আনন্দে মেতে উঠে। রাজধানী ঢাকাতে ‘ছায়ানট’এর উদ্যোগে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। সারা দেশব্যাপী সরকারি ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।



চিত্র: পহেলা বৈশাখ মঙ্গল শোভাযাত্রা

বর্ষবরণে গ্রাম ও শহরে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। নববর্ষ উপলক্ষে ঘরে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, পিঠাও খাবারের আয়োজন করা হয়। এগুলোর মধ্যে পান্তা-ইলিশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেমন-নৌকা বাইচ, লাঠি খেলার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া নবান্ন উৎসব, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদি লোকজ উৎসবের প্রচলন রয়েছে (মুরশিদ, ২০১০)। বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করেন।

জাতীয় দিবস

প্রতিবছর বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালিত হয়। মহান ভাষা শহিদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয়। ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ বাংলাদেশের সকল শহিদ মিনারে খালি পায়ে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গান গেয়ে ও ফুল দিয়ে সর্বস্তরের জনগণ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শহিদ দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রূপ লাভ করেছে।



চিত্র: স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন

‘স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ এবং ‘বিজয় দিবস’-এ রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষ থেকে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দিবসগুলো উদযাপন করা হয়।

পোশাক- পরিচ্ছদ

অতি প্রাচীনকাল হতে বাঙালিদের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে বাঙালি নারীদের প্রধান পোশাক শাড়ি ও ব্লাউজ। শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পোশাক হল শাড়ি। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শাড়ির মধ্যে জামদানি, ঢাকাই বেনারশি, রাজশাহীর রেশমী শাড়ি, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, কাতান শাড়ি ও পাবনার শাড়ি সুপ্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে ‘মসলিন’ শাড়ি সারা

পৃথিবীর মানুষের নজর কেড়েছিল। শাড়ি ছাড়াও মেয়েরা বিশেষত শহরাঞ্চলের মেয়েরা সালোয়ার কামিজ পরিধান করেন। এছাড়া মেয়েরা সোনা, রূপা ও মাটির তৈরি অলংকার ব্যবহার করে (মুরশিদ, ২০১০)। বাঙালি পুরুষরা প্রধান পোশাক হিসেবে ‘লুঙ্গি’ পরিধান করে। বিভিন্ন নকশা ও সুতায় বোনা লুঙ্গি গ্রামীণ জনপদের পুরুষদের নিত্য ব্যবহার্য প্রধান পোশাক। লুঙ্গি ছাড়া শহরাঞ্চলের পুরুষেরা পোশাক হিসেবে শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে। বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে ধুতি ও পাজামা-পাঞ্জাবির ব্যবহার লক্ষণীয় (মুরশিদ, ২০১০)।

পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে চাকমাদের পিনন-খাদি, মারমাদের লুঙ্গী-খামি ও ত্রিপুরাদের রিনাই-রিসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীরা ব্যবহার করেন বাঁশ-কাঠ ও রূপার তৈরি অলংকার। অনেকে পুঁতি কিংবা মুদ্রার মালা পরেন। আধুনিক সমাজের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নারীরাও সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি-ব্লাউজ এবং পুরুষেরাও শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে থাকে।

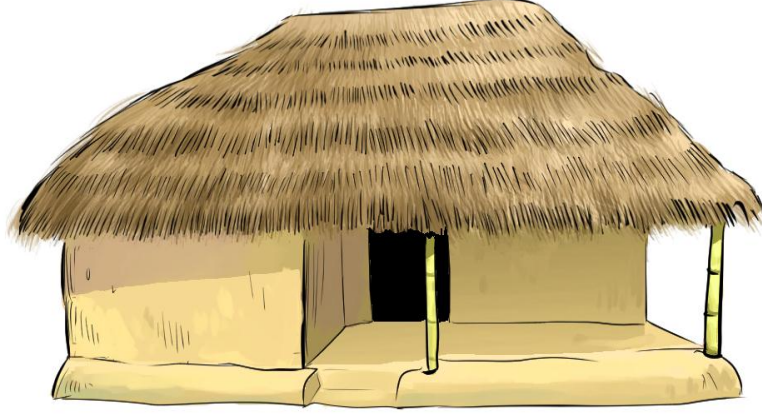
খাদ্যাভ্যাস ও রন্ধন প্রণালি

বাঙালিদের প্রধান খাবার হল ভাত ও মাছ। এ কারণে বলা হয়ে থাকে ‘মাছে ভাতে বাঙালি’। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্নদ্রব্য যেমন-পায়েস, ছানা, রসগোল্লা, দই, চমচম, রসমালাই এ দেশের খাদ্য সংস্কৃতির অন্যতম অংশে পরিণত হয়েছে (মুরশিদ, ২০১০)। চালের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পিঠা যেমন- চিতই পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, ধুপ পিঠা জনপ্রিয় খাদ্য হিসেবে প্রচলিত। তাছাড়া মুখরোচক খাবার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের আচার ও কাসুন্দি খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। বাংলাদেশে ইলিশ, রুই, কাতলা, বোয়াল, কালবাউস, চিংড়ি, কৈ, খরপোনা, পুটি, শোল, পাবদা, শিং, মাগুর, সরপুটি, টেংরা, মলা, ঢেঁতা, চাঁদা, গজার, পাঙ্গাস ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী অসংখ্য দেশীয় প্রজাতির মাছ বাঙালির খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে গুটিকি মাছ খাওয়ার অভ্যাস লক্ষণীয়। মাছের পাশাপাশি খাসি, হাঁস, মুরগি ও গরুর মাংস খাবার হিসেবে ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, শাক-সবজি ও ডাল খেয়ে থাকে।

বাঙালির রন্ধন প্রণালিতেও রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ঝাল মসলা, তেল, ঘি দিয়ে রান্না বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাবার বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়। এগুলোর মধ্যে পোলাও, কোর্মা, বিরিয়ানী, কোপ্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা জাতের সবজি দিয়ে রান্না মাছ বাঙালির খাবার সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য। তাছাড়া ‘নিরামিষ’ অনেক বাঙালির বিশেষ পছন্দের খাবার।

স্থাপত্য, চারুকলা ও কারুকলা

বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে স্থাপত্য, চারুকলা ও কারুশিল্পের বিকাশ সাধিত হয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন হল এদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য ‘কুঁড়েঘর’ বা ‘খড়ের ঘর’ (মুরশিদ, ২০১০)।

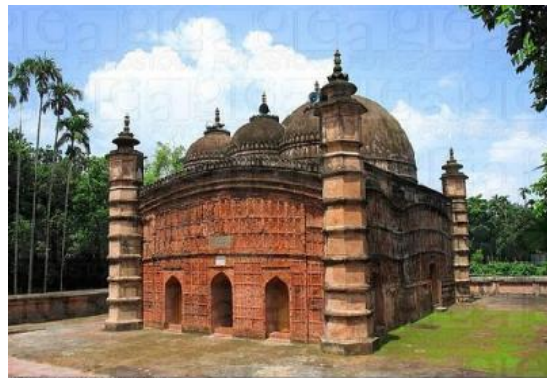


চিত্র : কুঁড়ে ঘর

দিনে দিনে বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রাচীনকালে থেকেই বাংলাদেশে নগরীর বিকাশ শুরু হয়েছিল। এ সমস্ত নগরীগুলো বড় বড় প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এসব নগরীতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৌদ্ধ বিহারে বিভিন্ন পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এসব অট্টালিকা বাংলার স্থাপত্যকলার নিদর্শন ধারণ করে আছে মধ্যযুগের স্থাপত্যশিল্প বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ঐশ্বর্যমন্ডিত। এ সময় বিভিন্ন মসজিদ, মাজার ও খানকাহ গড়ে ওঠে। এ সমস্ত মুসলিম স্থাপত্যগুলো বিশেষ গঠনশৈলী অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছিল। এক বা একাধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদগুলো ছিল বর্গাকৃতি বা আয়তাকার। মসজিদ নির্মাণে পাথর ও ইটের ব্যবহার লক্ষণীয়। মসজিদের গায়ে কুলুঙ্গি ও পোড়ামাটির অলঙ্কারের ব্যবহার করা হতো। এ সমস্ত স্থাপত্যেও অনেকগুলোতে মোগল স্থাপত্যরীতির ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এ সব মসজিদের মধ্যে বাবা আদম মসজিদ(১৪৮৩খ্রি.), ষাট গম্বুজ মসজিদ(পনের শতক), বাঘা মসজিদ(১৫২৩-২৪), কুসুম্বা মসজিদ(১৫৫৮-৫৯), আতিয়া মসজিদ (১৬১০-১১), লালবাগ দুর্গ মসজিদ(সতের শতকের শেষভাগ) বাংলার মুসলিম স্থাপত্যকলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।



চিত্র: বাবা আদম মসজিদ



চিত্র : আতিয়া মসজিদ

বাংলার মন্দিরসমূহও বিশেষ বিশেষ স্থাপত্য শিল্পের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বাংলা ধরনের মন্দির বা কুঁড়ে ঘরের আকারে নির্মিত মন্দিরের গঠন ছিল সাদামাটা। এ গঠনশৈলীকে ধারণ করে এক বাংলা, জোড় বাংলা, দোচালা, চারচালা ও আটচালা ধারায় মন্দির নির্মিত হয়েছে। দোচালা মন্দির বা জোড় বাংলা মন্দির সাধারণত একটি একক ভিত্তির উপর নির্মিত চতুষ্কোণ ঘরের উপর চতুর্দিকে ত্রমশ ঢালু হওয়া ছাদের সঙ্গে বাঁকানো কার্নিশ বিশিষ্ট মন্দির। এ ধারার মন্দির স্থাপত্যে বাংলার স্থানীয় কুঁড়ে ঘর নির্মাণের ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছিল(বাংলাপিডিয়া)। যেমন- যশোরের নলডাঙার গোপাল বাড়ি মন্দির(১৬৪৪খ্রি.), রংপুরের বর্ধনকুটির মন্দির, খুলনার (বর্তমানে সাতক্ষীরার) শ্যামসুন্দর মন্দির (১৭৬৭খ্রি.), ফরিদপুরের রাজা রাম মন্দির(আঠারো শতক) ও দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



চিত্র: শ্যামসুন্দর মন্দির

বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যসমূহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। এগুলোর মধ্যে সোমপুর বিহার ও ময়নামতির শালবনবিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের বৌদ্ধদের প্যাগোডাগুলো আকর্ষণীয় স্থাপত্যশৈলীর পরিচয় বহন করে।

ইংরেজ আমলে ইউরোপীয় প্রভাবে ঢাকায় বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পের প্রসার লাভ করে। হোসনি দালান, আহসান মঞ্জিল মুগল স্টাইলে হলেও পরবর্তীতে ইউরোপীয় স্টাইলের সংমিশ্রণ ঘটে। মোগল ও ইউরোপীয় স্থাপত্যের সমন্বয়ে কার্জন হল ও নর্থব্রুক হল তৈরি করা হয় (মুরশিদ, ২০১০)।



চিত্র: কার্জন হল

এ সমস্ত স্থাপত্য শিল্পের মাধ্যমে বাংলায় চারুকলা ও কারুকলার বিকাশ ঘটে। বাংলার প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্রেও চারুকলা ও কারুকলার ব্যবহার লক্ষণীয়। বিভিন্ন আসবাবপত্র, মাটির বাসন-কোসন ছাড়াও ব্রোঞ্জের তৈরি গয়না, বাতি, পোড়ামাটির তৈরি নকশা ও মূর্তি, রূপার মুদ্রা ও অলঙ্কার এবং রত্নালঙ্কার এ দেশের সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ইটের তৈরি প্রাচীরে পোড়া মাটির ফলক বা টেরাকোটা ও নানা রকমের মূর্তির খোদাই বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম বাহন। এ সমস্ত ফলকে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা লিপিবদ্ধ হয়েছে (মুরশিদ, ২০১০)।

চিত্রকলা বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম অংশ। যামিনী রায়, জয়নুল আবেদীন, এস এম সুলতান, কামরুল হাসানের মতো বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর জন্ম এ দেশে হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ চিত্রকর্মটি বিশ্বজুড়ে সুনাম কুড়িয়েছিল। যামিনী রায়ের চিত্রকলায় এ দেশের সাঁওতালদের লোকশিল্প, ধর্মীয় কাহিনী ও প্রাত্যহিক জীবন স্থান পেয়েছে। এস এম সুলতানের চিত্রকলায় বাংলার শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কামরুল হাসানের চিত্রকলায় বাংলার লোকজ ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে।



চিত্র: জয়নুল আবেদিনের আঁকা



চিত্র: এস এম সুলতানের আঁকা



চিত্র: কামরুল হাসানের আঁকা

হস্তশিল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান। মৃৎ শিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প এবং সূচী শিল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। ঘটচিত্র, সরার চিত্র, শখের হাঁড়ি, টেপা পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈরী নানা তৈজসপত্র, ‘নকশীকাঁথা’ ইত্যাদি এ দেশের আবহমান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয় (মুরশিদ, ২০১০)।

খেলাধুলা

বাংলাদেশে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার প্রচলন রয়েছে। হা-ডু-ডু বা কাবাডি এ দেশের জাতীয় খেলা। বর্তমানে কাবাডি আন্তর্জাতিকভাবেও খেলা হয়। কাবাডি খেলা মূলত পালাপার্বণে ও বিভিন্ন উৎসবে গ্রামবাংলায় আয়োজন করা হয়। এটি এ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম অংশে পরিণত হয়েছে। কাবাডি খেলা ছাড়াও গ্রামীণ জনপদে লাঠি খেলা অনেক জনপ্রিয়। বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে এই লাঠি খেলার আয়োজন করা হয়। সাধারণত বৈশাখী মেলাতে ও ধর্মীয় উৎসবে এ খেলার আয়োজন বেশি হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে গোপ্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, বৌচি প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী খেলার প্রচলন রয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকাবাইচ জনগণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। এটি বাংলাদেশের লোকায়িত সংস্কৃতির অংশ (আহমদ, ১৯৭৪)। মোরগ লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়ার দৌড় প্রভৃতি বাংলাদেশের ঐতিহ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা বেশ জনপ্রিয়। নব্বই-এর দশক হতে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে আসছে।

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির তুলনায় এগিয়ে ছিল। কৃষ্টি-সভ্যতার বিকাশের ফলে এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে দ্রুত আকৃষ্ট করেছিল। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী বঙ্গ দেশে রাজত্ব করেছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা ঐতিহাসিক স্থান। এসব স্থানে রয়েছে বহুবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শন। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনের বর্ণনা দেয়া হলো:

উয়ারী-বটেশ্বর

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের নাম উয়ারী- বটেশ্বর। নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রাম দুটি অবস্থিত। গ্রাম দুটি ছাপাক্ষিত রৌপ্যমুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হিসেবে দীর্ঘদিন পরিচিত। প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র নদ গ্রাম দুটোর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। উয়ারী প্রত্নস্থলে আবিস্কৃত হয়েছে ৬০০মি. x ৬০০মি. আয়তনের চারটি মাটির দুর্গ প্রাচীর আবিস্কৃত হয়। এছাড়া দুর্গ প্রাচীরের চারিদিকে রয়েছে পরিখা। আবিস্কৃত প্রত্নবস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একাধারে একটি নগর ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী (বর্তমানে ক্যামব্রিজের অধ্যাপক) মনে করেন যে, উয়ারী-বটেশ্বরের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিল। কারণ এখানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, কাঁচের পুঁতি, স্বর্ণ আবৃত কাঁচের পুঁতি, টিন মিশ্রিত ব্রোঞ্জ ইত্যাদি এ সভ্যতার প্রমাণ দেয় (বাংলা পিডিয়া)। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা খ্রিষ্টের জন্মের ৪৫০ বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন। ফলে এটি মৌর্য বংশের সমসাময়িক সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে। (ড.আশফাক হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা ২০১১)।



মৃৎপাত্র



চিত্র: উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ



নানা ধরনের পুঁতি

মহাস্থানগড়

মহাস্থানগড় বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। বগুড়া শহর হতে প্রায় ১৩ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত মহাস্থানগড় একসময় বাংলার রাজধানী ছিল। পূর্বে মহাস্থানগড়ের নাম ‘পুন্ড্রবর্ধন’ বা ‘পুন্ড্রনগর’ ছিল।



চিত্র: মহাস্থানগড়

এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম পুরাকীর্তি। ঐতিহাসিকদের মতে মহাস্থানগড় কমপক্ষে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা (যাকারিয়া, ২০০৭)। ভাসু বিহার, ভীমের বাঙ্গাল, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, কালিদহ সাগর, জিয়ত কুন্ড, গোকুল মেধ বা কিংবদন্তির বেহুলা-লক্ষীন্দরের বাসরঘর, খোদার পাথর ভিটা, মালখালীর কুন্ড, বন্দুকধারা, হাতিবান্ধা, ধোপাপত্রাবা বা ধোপার পুকুর, হাতি ডোবা পুকুর, মনিরঘোন, শিলাদেবীর ঘাট, মথুরা চিঙ্গাসপুর, কাজির ঘাট, ছেলীরধাপ, গোদারকাপ, ধোলাইধাপ প্রভৃতি কালের সাক্ষী হয়ে আছে। মহাস্থানগড় প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত একটি দুর্গনগরী ছিল। মহাস্থানগড় হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হিসাবে সর্বজনবিদিত।

ময়নামতি

ময়নামতি বাংলাদেশের কুমিল্লা শহর হতে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান এবং প্রাচীন বাংলার নিদর্শনের অন্যতম উৎসস্থল। এটি ময়নামতি লালমাই অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনের অন্যতম। সাত থেকে এগারো শতকের মধ্যে লালমাই পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এ বিশাল বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র (বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা-২০১১)।



চিত্র: ময়নামতি

মেঘনা বেসিনের ভাটিতে গোমতী নদীর তীরস্থ ময়নামতি গ্রাম থেকে লালমাই রেলস্টেশনের নিকটে চান্দিমুরা পর্যন্ত এটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৭ কিলোমিটার বিস্তৃত। এর প্রশস্ততম অংশটি ৪.৫ কিলোমিটার চওড়া এবং সর্বোচ্চ চূড়াটি ৪৫ মিটার উঁচু। ময়নামতি প্রাচীন বঙ্গ সমতটের (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) স্মৃতিস্তম্ভ, খননকৃত ধ্বংসাবশেষ সম্বলিত। এটি প্রাচীন বাংলার অতীত গৌরবের নিদর্শন। ময়নামতির প্রত্নস্থলের মধ্যে কোটীলা মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, চারপত্র মুড়া ও শালবন বিহার অন্যতম (যাকারিয়া, ২০০৭)।

শালবন বিহার

ময়নামতির খননকৃত প্রত্নস্থানসমূহের মধ্যে শালবন বিহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শৈলরাজির প্রায় কেন্দ্রে বর্তমানে কোর্ট বাড়িতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির নিকটস্থ লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝিতে এই বিহারটি অবস্থিত। এটি একটি বৌদ্ধ বিহার। বিহারটি চারদিকে শাল-গজারির বন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এই বিহারটির নামকরণ করা হয়েছিল শালবন বিহার। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভব দেব এই বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন।



চিত্র: শালবন বিহার

শালবন বিহারের প্রতিটি বাহু ১৬৭.৭ মিটার দীর্ঘ এবং বিহারের চারদিকের দেয়াল পাঁচ মিটার পুরু। কক্ষগুলো বিহারের চারদিকের বেষ্টনী দেয়াল পিট করে নির্মিত। বিহারের প্রবেশ বা বাহির হওয়ার জন্য একটি মাত্র পথ রয়েছে। বিহার প্রাঙ্গণের মাঝখানে কেন্দ্রীয় মন্দির। শালবন বিহারে সর্বমোট ১৫৫টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের দেয়ালে তিনটি কুলুঙ্গি রয়েছে। এই কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ থাকতেন এবং বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্মচর্চা করা হতো।

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারটি সোমপুর বিহার বা মহাবিহার নামেও পরিচিত (চৌধুরী, ২০০৫)। এটি বাংলাদেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান ও প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম নিদর্শন। রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় এটি অবস্থিত। পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল অষ্টম শতকের শেষ দিকে বা নবম শতকের প্রথম ভাগে এই বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন। পুন্ড্রনগর ও কোটিবর্ষের মাঝামাঝি ১০ হেক্টর অঞ্চল জুড়ে এই পুরাকীর্তিটি অবস্থিত। এটির ভূমি পরিকল্পনা চতুর্ভুজ আকৃতির। লৌহজাত পদার্থের উপস্থিতির কারণে এর মাটি লালচে। ভূমি হতে

৩০.৩০ মিটার উঁচুতে পাহাড় সদৃশ স্থাপনা হিসেবে এটি টিকে আছে। এই বিহার উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। আর প্রাচীরের গা ঘেঁষে ভেতরের দিকে ছিল ১৭৭টি কক্ষ, যেখানে অবস্থান করতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা।



চিত্র: পাহাড়পুর

১৮৭৯ সালে এখানে ব্যাপক খননকার্য পরিচালনা করা হয়। ১৯০৪ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক আইনের আওতায় এ স্থান ১৯১৯ সালে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৫ সালে পাহাড়পুরকে বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি অন্যতম নিদর্শন হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। স্থাবর স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে বিহার, কেন্দ্রীয় মন্দির, উন্মুক্ত অঙ্গন, স্নানাগার ও শৌচাগার এবং অস্থাবর স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে পোড়ামাটির ফলক, প্রস্তর ভাস্কর্য, চুনবালি সমন্বয়ে গঠিত মাথা, ধাতব মূর্তি, তাম্রশাসন ও শিলালিপি, মুদ্রা, মৃন্ময় পাত্র উল্লেখযোগ্য।

সোনারগাঁও

সোনারগাঁও ‘স্বর্ণগ্রাম’ বা ‘সুবর্ণগ্রাম’ নামে অভিহিত বঙ্গের এক প্রাচীন জনপদ। ঢাকা থেকে ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। পূর্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের অবসানের (১৩০২খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত সোনারগাঁও বঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল। এ সময়ের পর থেকে বাংলায় মুসলিম শাসকদের অধীনে পূর্ববঙ্গের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে সোনারগাঁও (বাংলাপিডিয়া)। সোনারগাঁও পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী ও উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বার ভূঁইয়াদের অন্যতম ঈসা খাঁ দীর্ঘ



চিত্র: সোনারগাঁ

সময় সোনারগাঁ শাসন করেছেন। বিভিন্ন নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার কারণে সোনারগাঁকে শত্রুপক্ষ সহজেই আক্রমণ করতে পারত না। সোনারগাঁ বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে ঐতিহাসিক পানাম নগর, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, পাঁচ পীরের মাজার, গোয়ালদী মসজিদ, পরীবিবির দীঘি প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান বাংলার ঐতিহ্য ও সভ্যতার স্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পরিচয় এবং লালনের জন্য এখানে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ও কারুপল্লী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ষাটগম্বুজ মসজিদ

ষাটগম্বুজ মসজিদ সুলতানী আমলের সর্ববৃহৎ মসজিদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য। এটি বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অনুমান করা হয় ১৫ শতাব্দীতে খান-ই-জাহান এটি নির্মাণ করেন।



চিত্র: ষাটগম্বুজ মসজিদ

মসজিদটির উত্তর-দক্ষিণের বাইরের অংশ প্রায় ১৬০ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের অংশ প্রায় ১০৪ ফুট এবং ভিতরের অংশ প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলো প্রায় ৮.৫ মিটার পুরু। সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর আমলে (১৪৩৫-৫৯) খান আল-আজম উলুগ খানজাহান বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে শাসনের ক্ষমতা অর্জন করেন এবং সুলতানের সম্মানে তিনি এই এলাকার নাম খলিফাবাদ রাখেন। তিনি বৈঠক করার জন্য একটি দরবার গড়ে তোলেন যা পরবর্তীতে ষাটগম্বুজ মসজিদে রূপান্তরিত হয়। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ১১টি বিরাট খিলানযুক্ত দরজা ও উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে ৭টি দরজা রয়েছে। মসজিদের ৪টি কোণে ৪টি মিনার ও ভিতরে ৬০টি স্তম্ভ বা পিলার রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে পশ্চিম দেয়ালে ১০টি মিহরাব রয়েছে। এর মাঝখানের মিহরাবটি আকারে বড় ও কারুকার্য খচিত। কালের পরিক্রমায় এ মসজিদটির অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। তবে ব্রিটিশ সরকার থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সরকার মসজিদটি রক্ষায় নানা রকম সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এটি বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থান। ইউনেস্কো ১৯৮৩ সালে এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহীর মর্যাদা দেয় (যাকারিয়া, ২০০৭)।

লালবাগ কেল্লা

লালবাগ কেল্লা একটি মোগল প্রাসাদ দুর্গ। এটি আওরঙ্গজেব দুর্গ নামেও পরিচিত। পুরাতন ঢাকা নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে দুর্গটির অবস্থান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ মুহম্মদ আযম শাহ সুবাদার থাকাকালীন ১৬৭৮ খ্রি.এই দুর্গটির নির্মাণকাজ শুরু করেন। দুর্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই পিতার ডাকে দিল্লিতে যান, আর দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব পরে তাঁর উত্তরসূরি সুবাদার শায়েস্তা খানের উপর। তবে মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে তিনি অংশ নেয়ায় দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব পড়ে পরবর্তী সুবেদার নওয়াব শায়েস্তা খানের উপর। ১৬৮৪ খ্রি.শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবি মারা গেলে দুর্গটিকে অপয়া হিসেবে বিবেচনা করে এর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শায়েস্তা খান ঢাকায় অবস্থান করলেও দুর্গের কাজ সমাপ্ত করেননি (বাংলাপিডিয়া)।



চিত্র: লালবাগ কেল্লা

বর্তমানে এটিই ‘লালবাগ কেল্লা’ নামে অধিক পরিচিত। এটি সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এতে প্রধান ফটকসহ মোট তিনটি ফটক রয়েছে। দুর্গের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্য নিদর্শন হলো এর দক্ষিণ তোরণ। এই তোরণের সম্মুখভাগের দুই দিক দুটি সুউচ্চ সবু পিলার দ্বারা সুশোভিত। দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালের মাঝামাঝি প্রাচীরে ঘেঁষে একটি পুকুর রয়েছে। কেল্লার মধ্যে দরবার গৃহ ও হাম্মামখানা রয়েছে। দরবারগৃহের

পশ্চিমে শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির সমাধিসৌধ যা বাংলাদেশের অন্যতম একটি পুরাকীর্তি। এই মাজার মার্বেল পাথর, কষ্টি পাথর ও বিভিন্ন রকমের ফুল, পাতা শোভিত চাকচিক্যময় টালির সাহায্যে অভ্যন্তরীণ কক্ষগুলো অলংকৃত। এছাড়াও তিন গম্বুজবিশিষ্ট লালবাগ কেল্লা মসজিদ রয়েছে। এছাড়া শায়েস্তা খানের বাসভবনের পাশে একটি কামান রয়েছে, যা ঐ সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

উত্তরা গণভবন

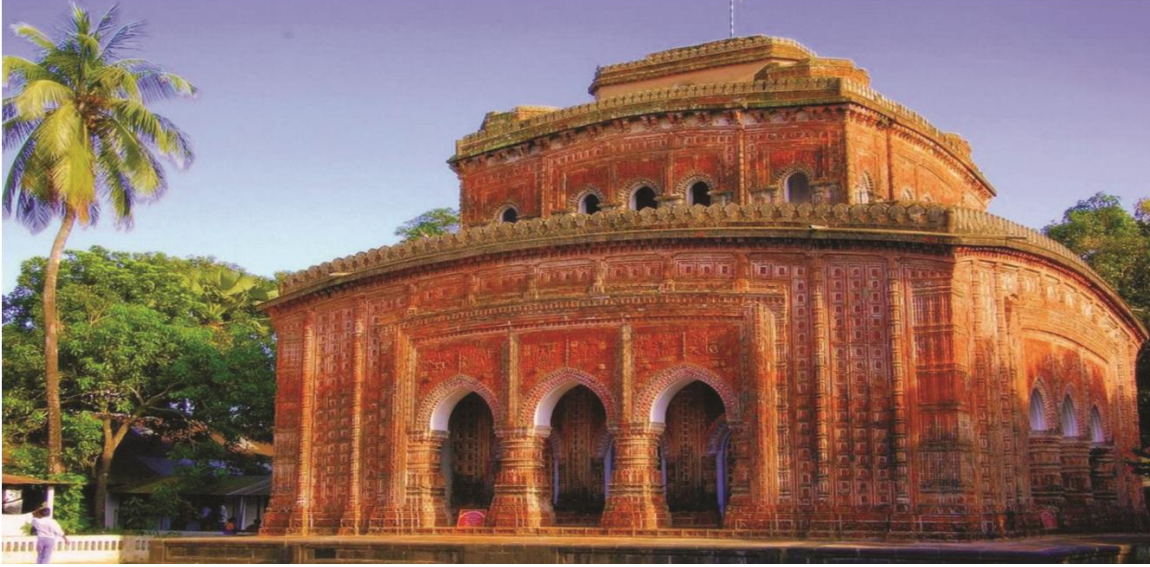
নাটোর শহর থেকে ২.৪ কিলোমিটার দূরে উত্তরা গণভবন অবস্থিত। এটি মূলত দিঘাপতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান ছিল, যা দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী নামে পরিচিত। দয়ারাম রায় (১৬৮০-১৭৬০) দিঘাপতিয়া প্রাসাদের মূল অংশ ও এর সংলগ্ন আরও কিছু ভবন নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পের ফলে প্রাসাদটি ধ্বংস হলে প্রমোদনাথ রায় সম্পূর্ণ প্রাসাদটি পুনঃনির্মাণ করেন। ৪৩ একর জায়গা জুড়ে প্রাসাদ এলাকাটি একটি পরিখা ও উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাসাদের পূর্ব পাশে রয়েছে চারতলাবিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির প্রবেশদ্বার, যা উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে একটি ঘড়িসম্বলিত টাওয়ারে শেষ হয়েছে। প্রাসাদটির প্রধান প্রবেশ পথের সিঁড়ির দু'প্রান্তে রয়েছে প্রমাণ সাইজের ঢালাই লোহায় নির্মিত নব্য-ক্লাসিক্যাল গ্রিক রীতির অসাধারণ দু'টি নারী ভাস্কর্য। প্রাসাদের দক্ষিণ ব্লকের সামনে রয়েছে ঝর্ণা সমৃদ্ধ একটি আকর্ষণীয় বাগান। চার কোণের ফাঁকা চতুরে মার্বেলের নারী ভাস্কর্য এর নান্দনিকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান প্রাসাদ ব্লকটির নিকটবর্তী দক্ষিণাংশের দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল ভবনটিই হলো কুমার প্যালেস। প্রাসাদের বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয়ে গেলেও এখনও বিভিন্ন জিনিসের মাঝে আছে নব্যক্লাসিক্যাল গ্রিক ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য, ফুলদানি, ঝাড়বাতি, খোদাইকৃত কাঠের পালংক ও আসবাবপত্র(বাংলাপিড়িয়া)। ১৯৬৭-এর ২৪ জুলাই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এটিকে 'গভর্নর হাউস' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সরকার একে 'উত্তরা গণভবন' হিসেবে ঘোষণা দেন।



চিত্র: উত্তরা গণভবন

কান্তজির মন্দির

কান্তজির মন্দির ইটের তৈরি আঠারো শতকের মন্দির। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার উত্তরে এবং তেতুলিয়া সড়কের প্রায় ২কি.মি. পশ্চিমে ঢেপা নদীর পাড়ে এক শান্ত নিভৃত গ্রাম কান্তনগরে এ মন্দির স্থাপিত। শিলালিপির সূত্রানুযায়ী দিনাজপুরের বিখ্যাত জমিদার মহারাজ প্রাণনাথ রায় ১৭২২ সালে এ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তাঁর দত্তকপুত্র মহারাজ রামনাথ রায় ১৭৫২ সালে মন্দিরটির নির্মাণ সম্পন্ন করেন। বিশ শতকের শুরুর দিকে মহারাজা গিরিজানাথ বাহাদুর ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়টি শিখর ছাড়াই ব্যাপক সংস্কার করেন (বাংলাপিডিয়া)। এটি পোড়ামাটির চিত্রফলক শিল্পের বা টেরাকোটার এক অতুলনীয় নিদর্শন।



চিত্র: কান্তজির মন্দির

রামায়ণ মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত কাহিনী এই চিত্রফলকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালির সমাজ জীবনের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এটি প্রায় ১ মিটার উচু পাথরের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো মন্দিরটির উচ্চতা ১৫ মিটারের বেশি। মন্দিরের চারদিকে মোট চারটি আয়তাকার বারান্দা রয়েছে। নিচতলার চার প্রকোষ্ঠের বাইরে মোট ২১টি খিলান দরজা, দ্বিতীয় তলায় ২৭টি ও তৃতীয় তলায় মাত্র তিনটি প্রবেশ দরজা আছে। তবে মন্দিরের মূল কক্ষটি বেশ ছোট।

আহসান মঞ্জিল

ঢাকার কুমারটুলিতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। এটি ঢাকার নবাবের প্রাসাদ ও কাচারি ছিল। কথিত আছে মোগল আমলে এখানে জামালপুর পরগণার জমিদার শেখ এনায়েতউল্লাহর রঙমহল ছিল। পরে তাঁর পুত্র মতিউল্লাহর নিকট থেকে এটি ফরাসিরা ক্রয় করে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৮৩০ সালে খাজা আলীমুল্লাহ ফরাসিদের নিকট থেকে কুঠিবাড়ি কিনে নেন। পরবর্তিতে নওয়াব খাজা আব্দুল গনি ১৮৫৯-১৮৭২ সালের মধ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-এর নামে নামকরণ করেন।



চিত্র: আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। ১ মিটার উঁচু প্লাটফর্মের উপর এটি নির্মিত। দুই তলাবিশিষ্ট প্যালেসটি ১২৫.৪ মিটার দীর্ঘ এবং ২৮.৭৫ মিটার প্রস্থ। প্রথমতলার ও দ্বিতীয়তলার উচ্চতা যথাক্রমে ৫ মিটার ও ৫.৮ মিটার। আহসান মঞ্জিলকে কেন্দ্র করেই নবাব খাজা সলিমুল্লাহর রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। বাংলাদেশ সরকার আহসান মঞ্জিলকে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৯২ সালে পুনঃসংস্কার করে জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং এখানে একটি জাদুঘর স্থাপন করা হয়। এটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

মুজিব নগর

মুজিব নগর মেহেরপুর জেলাতে অবস্থিত। আগে এই গ্রামটির নাম বৈদ্যনাথতলা ছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই গ্রামের আম্রকাননে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকার কারণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ মন্ত্রিসভার অন্য মন্ত্রীরা এখানে শপথ গ্রহণ করেন।



চিত্র: মুজিব নগর স্মৃতিসৌধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে এই গ্রামের নাম পরিবর্তন করে ‘মুজিবনগর’ রাখা হয়। বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছরের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস হিসেবে পালন করে। ফলে এই দিনটি বাঙালি জাতির জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন।

বৈদ্যনাথতলায় যে জায়গায় মঞ্চ তৈরি করে অস্থায়ী প্রবাসী সরকার শপথ নিয়েছিল সেখানে স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়েছে যা ‘মুজিব নগর স্মৃতিসৌধ’ নামে পরিচিত। ১৬০ফুট ব্যাসের গোলাকার মূল বেদীর উপর ২৩টি কংক্রিটের ত্রিকোণাকার স্তম্ভ সমন্বয়ে উদীয়মান সূর্যের প্রকৃতিকে পটভূমি করে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মিত। স্মৃতিসৌধে ছোট থেকে বড় মোট ২৩টি স্তম্ভ আছে, যার অর্থ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ২৩ বছর শাসনের প্রতীক। এই ২৩ বছরে বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে যে সংগ্রাম গড়ে তোলে তারও প্রতীক। স্মৃতিসৌধে ৯টি সিঁড়ি আছে, যা ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাস যুদ্ধ চলাকালীন সময়কে বুঝায়। বেদীর একটি অংশে অসংখ্য গোলাকার বৃত্ত দ্বারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদকে বুঝানো হয়েছে। তিন ফুট বেদীর অপরাংশে অসংখ্য নুড়ি পাথরে আবৃত। এটি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতীক (বাংলাপিডিয়া)। আর ৩ লাখ বড় পাথর আছে যার অর্থ দেশের ৩ লাখ মা-বোনের সম্মুখীন বিনিময়ে এসেছে সেই মহার্ঘ্য স্বাধীনতা (ইত্তেফাক, ২০১১)। মুজিব নগরে প্রবেশের পথে বিশাল গেট আছে যা ‘মুজিব গেট’ হিসাবে পরিচিত। মুজিবনগরে ৬ দফাভিত্তিক ৬ প্রজাতির ২২শ’ গোলাপ গাছের বাগান, ১৩শ’ বৃক্ষ শোভিত আম বাগান রয়েছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র রয়েছে। এ মানচিত্রের উত্তর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় ৪ নেতা ও জিয়াউর রহমানসহ ৪শ’ ভাস্কর্য রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গবন্ধু তোরণ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকেন্দ্র, স্বাধীনতা ক্লাব ও পাঠাগার, শেখ হাসিনা মঞ্চ, প্রশাসনিক ভবন, টেনিস মাঠ, পর্যটন মোটেল, বিশ্রামাগার, শিশুপল্লী ও ডরমেটরি।

অধ্যায় ১২

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

বাংলাদেশে ৪৫ টিরও বেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। যেমন-গারো, চাকমা, খাসি, মণিপুরি, সাঁওতাল, মারমা, হাজং, রাখাইন, মুরং, ত্রিপুরা, চাক, কুকি, লুসাই, ওরাওঁ, খুমী, শ্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, ব্যাম, মগ, খিয়াং, পাহাড়িয়া, পাংখো, পট্টা, রাজবংশী ইত্যাদি। এরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এসব জাতির রয়েছে আলাদা ভাষা, স্বতন্ত্র জীবনধারা, বৈচিত্র্যময় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি যা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

গারো

বাংলাদেশে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো গারো। এ গোষ্ঠীটি গারো নামে বহুল পরিচিত হলেও এরা নিজেদেরকে আচিক্ মান্দে (পাহাড়ের মানুষ) বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, গাজীপুর জেলায় গারোদের বসবাস। তবে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতী, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় অধিকাংশ গারোদের বাস। ভারতের মেঘালয় রাজ্যেও গারোদের বসবাস রয়েছে।



চিত্র: ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত গারো রমণী পুরুষ



চিত্র: ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত গারো

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ৩-৫ হাজার বছর পূর্বে গারোরা চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিন-কিয়াং প্রদেশের কোকোনের হ্রদের উত্তর-পূর্ব তীরে বসবাস করত। বিভিন্ন কারণে ঐ অঞ্চল থেকে সরে এসে তিব্বতও ভুটান হয়ে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে। তবে এদের মূল বসতি গড়ে উঠে গারো পাহাড়কে ঘিরেই। বাংলাদেশে গারোদের সংখ্যা প্রায় ১,২৯,০০০ (joshuaproject.net)। এর মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ বাস করে ময়মনসিংহ অঞ্চলে (১৯৯০, বিরিশিরি সাংস্কৃতিক একাডেমী)।

নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে গারোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর তিব্বতী বর্মণ শাখার বোডো (Bodo) উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। গারোদের মুখমণ্ডল গোলাকার। চুল ও চোখের রং কালো। চোখের আকৃতি ছোট, নাক চ্যাপ্টা, চোয়াল সামান্য উঁচু ও কপাল চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মতোই গারো পুরুষদের হালকা দাড়ি-গোঁফ দেখা যায়। তাদের গায়ের রং ফর্সা কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের। গারোরা খুব একটা লম্বা না হলেও শারীরিকভাবে খুবই শক্তিশালী ও কর্মঠ হয়ে থাকে।

গারোদের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। মা পরিবারের প্রধান ও সমস্ত সম্পত্তির মালিক। স্ত্রীর বাড়িতে স্বামী অবস্থান করেন। পারিবারিক কাজকর্ম সম্পাদন করার দায়িত্ব স্বামীর ওপর। পরিবারের সন্তানরা মায়ের পদবী ধারণ করে। কন্যাসন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মাতা অন্য কোনো কন্যাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করলে, রীতি অনুযায়ী পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। উত্তরাধিকারী কন্যাকে বলা হয় ‘নক্না’। আর অন্য কন্যারা ‘এগেট’ নামে অভিহিত হন। নক্না বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। পরিবারের ছেলে সদস্যরা বিয়ের পর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। গারো বিয়েতে কোনো যৌতুকের প্রচলন নেই। গারোদের একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এ সমাজে এক বিবাহ প্রথাই বেশি লক্ষণীয়।

স্থানীয়ভাবে গারোদের ভাষাকে বলা হয় ‘মান্দি’ বা আচিক। গারোদের ভাষার কোন বর্ণমালা নেই। লিখে মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাংলাদেশের গারোরা বাংলা হরফ ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে অনেকেই নানা প্রয়োজনে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন।

ঐতিহ্যগতভাবে গারোদের ধর্মের নাম ‘সংসারেক’। অনেক গারো সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। নিজেদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। এদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে ওয়াংগালা (Wangala)। সমগ্র গারো সম্প্রদায় এ উৎসবে মাতোয়ারা হয়। উৎসবে গারো যুবক-যুবতীরা বিশেষ পোশাক পরিধান করে নৃত্য পরিবেশন করেন। নাচের সাথে মহিষের শিঙের বাঁশি ও ড্রাম বাজানো হয়। দিনে দিনে তারা খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী।

বাংলাদেশের গারোরা আগে জুম চাষ করতেন। ১৯৫০ সালে সরকারের নিষেধাজ্ঞার ফলে বর্তমানে হাল কৃষির প্রচলন দেখা যায়। তারা ধান, বিভিন্ন প্রকার সবজি ও আনারস উৎপাদন করে থাকেন। বর্তমানে গারোদের অনেকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন।



চিত্র: গারোদের উৎসব

গারো সম্প্রদায়ে গ্রামের প্রধানকে বলা হয় ‘নকমা’ বা ধনী মোড়ল। নকমা গ্রামের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বিচার সালিস পরিচালনা করেন। গারো সম্প্রদায়ে কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই। বর্তমানে গারো অঞ্চল বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আওতাধীন।

গারোরা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহার করেন। নিজেদের তৈরি গারো মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম ‘দক্‌মান্দা’। দক্‌মান্দায় বিভিন্ন শিল্পকর্ম চিত্রিত থাকে। বর্তমানে গারোরা আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। বাঙালিদের মতো পুরুষেরা লুঙ্গি, গেঞ্জি, পাজামা, শার্ট এবং মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার-কামিজ ও ওড়না ব্যবহার করেন। আগেকার দিনে গারো মহিলারা চাঁদিরূপার গহনা বেশি ব্যবহার করলেও বর্তমানে অবস্থাপন্ন মহিলারা সোনার গহনা ব্যবহার করেন।

গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতের সাথে তারা মাছ, মাংস, ডাল ও শাকসবজি খেয়ে থাকে। শুটকি মাছ, শুকরের মাংস, কচ্ছপ ও কুঁচে তাদের পছন্দের খাবার। বাঁশের কঁচি চারা ও ব্যাঙের ছাতা গারোদের অন্যতম প্রিয় সবজি। বর্তমানে তারা বাঙালি খাবারেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অতিথি আপ্যায়নে ও নানা পালাপার্বণে ধেনোপচুঁই মদ গারোদের নিকট অপরিহার্য। আবহমান কাল থেকে গারোরা সরল ও সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তবে বর্তমানে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে দিনে দিনে গারো সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে।

চাকমা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জনসংখ্যায় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা। এরা প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে চাকমা জাতিগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা ২,৫৩,০০০ জন। এদের মধ্যে ৯০%-এর বেশি বাস করে রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলায়।

চাকমারা ভাষাগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। চাকমারা এক ধরনের তিব্বতি-বার্মি ভাষায় কথা বলত। পরবর্তিতে তাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় রূপ লাভ করে। চাকমা ভাষার নিজস্ব লিপি থাকলেও এ লিপি আজকাল আর ব্যবহার করা হয় না। চাকমা ভাষা এখন সাধারণত বাংলা লিপিতেই লেখা হয় (বাংলাপিডিয়া)। বর্তমানে চাকমা জনগোষ্ঠীর অনেকে বাংলাভাষা শিখেছেন ও নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। চাকমারা মাঝারি আকৃতির এবং সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী। তাদের গায়ের রং ফর্সা, মুখমন্ডল গোলাকার, ঠোঁট পাতলা, চুল সোজা ও কালো রঙের এবং চোখের মণির রং কালো। এদের দাড়ি গৌফ কম ও দেহ প্রায় কেশহীন হয়।

চাকমাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত। ছেলেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। পিতার বংশ পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়। বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

অধিকাংশ চাকমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিছু চাকমা হিন্দু ধর্ম অনুসারী। এদের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদিতারও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চাকমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে বৈশাখী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা। তাদের কেউ কেউ গঙ্গা পূজা ও লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। চাকমাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব হচ্ছে বিজু উৎসব। এই উৎসব তিন দিন ধরে চলে।

চাকমাদের নিজ বংশে বা গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বহুবিবাহ অনুমোদিত, তবে এর প্রচলন কম দেখা যায়। বিধবা বিবাহ প্রথাও রয়েছে। চাকমা ছেলে অন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মেয়েকেও বিয়ে করতে পারেন। তবে চাকমা মেয়েদের বিয়ে চাকমা সমাজেই হয়ে থাকে।

চাকমা বিয়েতে বর কনের বাড়িতে যান না। বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়িতে গিয়ে কনে নিয়ে বরের বাড়িতে আসেন। বরের বাড়িতেই বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিয়ের পর নবদম্পতি স্বামীর পিতার গৃহে অথবা স্বামীর নিজ গৃহে জীবন শুরু করেন। বিয়েতে বরপক্ষ কন্যাকে বিয়ের পোশাক ও অলংকারাদি দিয়ে থাকেন। বিয়েতে যৌতুক প্রথার প্রচলন নেই।

চাকমা সমাজে পাড়া বা আদামের প্রধান হলেন ‘কার্বারি’, গ্রাম বা মৌজার প্রধান হেডম্যান এবং চাকমা সমাজ বা সার্কেলের প্রধান হলেন চাকমা রাজা। এই তিন নেতৃত্বেরই প্রধান কাজ হলো নিজ নিজ দায়িত্বে এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিচার-সালিস পরিচালনা করা, খাজনা আদায় করা। কারবারি খাজনা আদায়ে হেডম্যানকে সহায়তা করেন এবং হেডম্যান রাজাকে সহায়তা করেন।



চিত্র: ঐতিহ্যবাহী পোশাকে চাকমা নারী ও পুরুষ

জুম চাষ হলো জীবিকার প্রধান উৎস। নরম মাটিতে ধান, শসা, ঢেঁড়স, ভুট্টা, তুলা ইত্যাদি ফসল তারা উৎপাদন করেন। এছাড়া অনেকেই মোরগ-মুরগি ও শূকর পালন করেন। এছাড়া বন থেকে শাকপাতা ও সবজিও সংগ্রহ করেন। বাঁশ ও বেত দিয়ে কুটির শিল্পজাত সামগ্রী তৈরি করেন। চাকমা পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি পরিশ্রমী। বর্তমানে অনেক চাকমা পুরুষ ও মহিলা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

চাকমারা নিজেদের কাপড় নিজেরাই তাঁতে বুনে নেন। চাকমা মেয়েদের নিম্নাঙ্গের পরণের কাপড়ের নাম ‘পিনোন’ ও বক্ষবন্ধনীর নাম ‘খাদি’। পুরুষেরা কবোই এবং ধুতি ও গামছা পরেন। আর মাথায় বাঁধে ‘খবং’

(পাগড়ী)। বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে অনেকে শার্ট - প্যান্ট, লুঙ্গি এবং মহিলাদের অনেকে শাড়ি-ব্লাউজ পরেন।

চাকমাদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত। ভাতের সাথে মাছ, মাংস এবং শাক- সবজি খেতে ভালবাসেন। খাদ্যের মধ্যে মুরগী, শূকর, কাঁকড়া, ব্যাঙ, হরিণের মাংস এবং বাঁশ কোড়লের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঁশ কোড়ল দিয়ে বেশ কয়েক ধরনের রান্না ও ভাজি করেন। মদ তাদের প্রধান পানীয়। তারা নিজেরাই মদ তৈরি করে নেন।

চাকমারা মাটি থেকে উঁচুতে মাচার ওপর ঘর নির্মাণ করেন। মই-এর সাহায্যে ঘরে ওঠেন।



চিত্র: চাকমাদের বাসস্থান

চাকমা সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার রীতি খুব শক্তিশালী। চাকমা সমাজে সাধারণত মৃতদেহ পোড়ানো হয়, তবে বাচ্চাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। পুনর্জন্মে বিশ্বাসী বলে চাকমারা আত্মার কল্যাণে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

মণিপুরি

সিলেট বিভাগের সিলেট শহর ও শহরতলি, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও বড়লেখা, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে মণিপুরি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মণিপুরিদের সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে মণিপুরিরা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর তিব্বতি-বার্মি পরিবারের কুকি-চীন গোত্রভুক্ত। তবে মণিপুরীদের মধ্যে আর্য ও অন্যান্য রক্তের যথেষ্ট মিশ্রণ ঘটেছে। কালের বিবর্তনে এরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়।

মণিপুরিদের মাতৃভাষা ‘মেইতেই লন বা মণিপুরী ভাষা’। মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্য অতি প্রাচীন। এর একটি সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য ইতিহাস এবং দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। মণিপুরি ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামে মণিপুরি ভাষার প্রতিটি বর্ণের নামকরণ করা হয়েছে। বর্ণগুলোর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মণিপুরী ভাষা ক্রমান্বয়ে বাংলা বর্ণমালাতেই লিখিত হয়ে আসছে। অবশ্য বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে বিলুপ্ত মণিপুরী লিপি পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করা হচ্ছে (একে শেরাম ১৯৯৬)।

কৃষিকাজ হচ্ছে এদের প্রধান জীবিকা। তবে শহরাঞ্চলের মণিপুরিদের প্রধান পেশা হলো ‘স্বর্ণকার ও মটর মেকানিক্স’। মণিপুরি পুরুষ ও নারী একত্রে ক্ষেতে কাজ করেন। পুরুষরা হালচাষ করে, আর নারীরা করে শস্য বপন। মণিপুরি সম্প্রদায় ফসল লাগানো ও ফসল কাটার কাজটিকে উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপন করেন। নারীরা নিজেদের পরণের কাপড় ‘ফানেক’, ওড়না জাতীয় কাপড় ‘ইন্নাফি’ এবং গামছাসহ নিত্যব্যবহার্য কাপড়-চোপড় নিজস্ব তাঁতে বুঁনে থাকেন। বর্তমানে মণিপুরি বস্ত্র বাণিজ্যিক ব্র্যান্ড হিসেবে বিবেচিত।

মণিপুরি সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও ঐতিহ্যবাহী। নৃত্য ও সঙ্গীত মণিপুরি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কার্তিক মাসে রাস উৎসব মণিপুরিদের সবচেয়ে বড় উৎসব। চাকচিক্যময় নাচের পোশাক পরে মণিপুরিরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে এরা মদ পান করেন। বছরের বিভিন্ন ঋতুকে ঘিরে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। মণিপুরি বিয়ের সময় বর্ণাঢ্য প্যাভেল তৈরি করা হয়। বর ও কনে এ প্যাভেলের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে থাকলে বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের ওপর ধান-দূর্বা ছিটিয়ে আশীর্বাদ করেন। বিয়ের পর ৫ম দিন মেয়ে বাবা মায়ের বাড়িতে বরসহ আসেন এবং নিয়ম অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া উৎসবে অংশ নেন। গোত্রের সকলে নিমন্ত্রিত হয়ে বর-বধূকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে থাকেন।



চিত্র: মণিপুরি নৃত্য



চিত্র: মণিপুরি উৎসব

মণিপুরিরা ভদ্র, শান্তশিষ্ট ও আত্মনির্ভরশীল সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। পুরুষরা পাহাতি, ধুতি, পাঞ্জাবি আর মেয়েরা লাহিং পরিধান করে। অলংকার মেয়েদের খুবই পছন্দ। মণিপুরিদের ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম। একদা মণিপুর অঞ্চলে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচলিত ছিল (সিংহ, ২০০১, পৃ. ৬০)।

মণিপুরিদের ঘরবাড়ি ছাউনি দেয়া বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। তবে বিভবানরা দালানও তৈরি করেন। মণিপুরিদের পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার পিতার সম্মতির ওপর নির্ভর করে। ভাত,

মাছ ও শাকসবজি মণিপুরিদের প্রধান খাবার। বৈষ্ণব ধর্মে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ বলে তারা মাংস খান না। শুঁটকি ভর্তা খুবই প্রিয় খাদ্য। এছাড়া কয়েক রকম কাঁচা সবজির কচিপাতা দিয়ে ‘সিবেই’ (সালাদ) খেতে পছন্দ করেন। মণিপুরি খাবারে তুলনামূলকভাবে তেল ও মসলা কম ব্যবহার করা হয় (সিংহ, ২০০১, পৃ. ৬০)।

মারমা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মারমা সম্প্রদায় প্রধানত রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি-এ তিনটি পার্বত্য জেলায় বাস করেন। এছাড়া উপকূলীয় জেলাগুলোতেও কিছুসংখ্যক মারমার বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশে মারমা অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,৫৭,৩০১ জন (আদমশুমারি-১৯৯১)। মারমারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সাধারণত খাটো আকৃতির হয়ে থাকেন। গালের হাড় উঁচু, গায়ের রং খুব ফরসা, কালো চুল, ছোট চোখ এবং চ্যাপ্টা নাক এদের সাধারণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

মারমারা আরাকানি উচ্চারণে কথা বলেন, এদের ভাষা বার্মিজ হরফে লিখিত হয়। বর্তমানে শহর এবং এর কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাসরত মারমারা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। মারমা নৃগোষ্ঠী অনেকগুলো গোত্রে বিভক্ত। আদিবাসভূমির নামানুসারে গোত্রগুলোর নামকরণ করা হয়েছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে অধিকাংশ মারমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কেউ কেউ আবার সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। মারমা বৌদ্ধরা নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন বৌদ্ধ অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে তারা সাধ্য অনুযায়ী দানও করে। অন্যান্য বৌদ্ধদের মত মারমা বৌদ্ধরাও বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা এবং মাঘী পূর্ণিমা উদযাপন করেন।

মারমাদের বাড়ি সাধারণত মাটি থেকে উঁচুতে কাঠ অথবা বাঁশের পাটাতন বা মাচং-এর ওপর নির্মিত হয়। ঘর তৈরির কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, খড় ও বুনো ঘাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ঘরই একই সাথে শোবার জন্য এবং ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাচং-এর নিচের খোলা জায়গায় সাধারণত গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি রাখা, রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ সংরক্ষণ করা হয়। একই সাথে সেখানে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড় বোনার জন্য তাঁত বসানো হয়। তবে কোথাও কোথাও মাচং ব্যতীত সমতল জায়গায় মাটির ঘরও দেখা যায়।

ভাত ও সিদ্ধ শাকসবজি মারমাদের প্রধান খাবার। তবে নাপ্পি (Nappi) নামক শুঁটকি মাছের মন্ড মারমাদের অতি প্রিয়। তারা ভাত থেকে তৈরি মদ পান করেন। চুবুট সেবন/পান তাদের নিকট প্রিয়। রান্নার জন্য মারমারা প্রধানত মাটির জিনিসপত্র ব্যবহার করেন। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে বাঁশ ও কাঠের তৈরি জিনিসপত্রও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন।



চিত্র: মারমা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ও পূজা

মারমা পুরুষরা মাথায় ‘গমবং’ (পাগড়ী), গায়ে জামা ও নিম্নাঙ্গে লুঞ্জি (লুঙ্গি) পরেন। মহিলারা গায়ে ‘আঞ্জি’ (ব্লাউজ) ও নিম্নাঙ্গে ‘থামী’(স্কার্ট) পরিধান করেন। মারমারা হস্তচালিত তাঁত ও কোমর তাঁত ব্যবহার করে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র নিজেরাই তৈরি করেন। বর্তমানে অনেককে অবশ্য অন্য পোশাকও ব্যবহার করতে দেখা যায়।

মারমারা সাধারণত ফুর্তিবাজ, সরল এবং হাসিখুশি প্রকৃতির মানুষ। তাদের মহিলারা সৌন্দর্যপ্রিয় এবং সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। পুরুষরা বেশি কৌতুকপ্রিয়। অতিথিদেরকে তারা সাধ্যমত খানাপিনা দিয়ে আপ্যায়ন করে। এমনিতেও যে কোন অতিথি বাড়িতে এলে পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন।



চিত্র: জলোৎসব

মারমারা বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে ‘সাংখাই’ উৎসব উদযাপন করেন। এ সময় তাদের মধ্যে ‘পানিখেলা’ বা ‘জলোৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবে নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা বা বড় বড় পাত্রে জল রাখা হয়। সুসজ্জিত তরুণী বা যুবতীরা দলে দলে জলের পাত্রসহ পানি খেলা স্থানে তরুণ বা যুবকদের দেহে জল ছিটায়। তাদের প্রতি সাড়া দিয়ে তরুণ বা যুবকরাও তরুণী বা যুবতীদের প্রতি জল ছিটায়। এ উৎসব হাসি

আনন্দে ও কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠে। বান্দরবান ও রাজমাটিতে এ উৎসব বেশ আনন্দ উৎসাহের সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে।

মারমাদের সামাজিক জীবনে বিবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এদের মধ্যে বহুবিবাহ ও প্রাকবিবাহ প্রচলিত আছে। তবে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ। সাধারণত ছেলের পছন্দ করা মেয়ের সাথে সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। মারমা বরকে ‘লাংসা’ এবং কনেকে ‘খাম্বাসা’ বলে।

মারমা সম্প্রদায়ের মধ্যে একক পরিবারের প্রচলন দেখা যায়। স্বামীরা যদিও পরিবারের প্রধান তথাপি মারমা নারীদের পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিবাহ সম্বন্ধীয় সম্পর্ক অথবা সগোত্রীয় সম্পর্ক যাই হোক না কেন, মারমা সমাজে সম্পর্কের বন্ধন খুবই শক্তিশালী। ছেলে এবং মেয়ে ২:১ অনুপাতে পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ‘Auroth’ অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটি বসতবাড়ির মালিকানা লাভ করে। বিনিময়ে তিনি আমৃত্যু পিতা-মাতার তত্ত্বাবধান করেন।

কৃষিকাজ মারমাদের প্রধান পেশা, বিশেষ করে জুম চাষ। এছাড়া মারমারা বিভিন্ন গাছের পাতা, মূল ও কাণ্ড জাতীয় খাবার বন থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। অর্থনৈতিক কার্যাবলির মধ্যে বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি বুনন, মদ জাতীয় পানীয় প্রস্তুত করাই প্রধান। মারমা নারীরা তাঁত বোনার কাজও করেন। বর্তমানে মারমারা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেও ঝুঁকছেন।

খাসি

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বাংলাদেশে বসবাসরত আরেকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো খাসি। এটি বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী। আদি বাসভূমি তিব্বত থেকে তারা আসাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছেন। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর এবং ছাতক অঞ্চলে এদের বাস। তাদের নাক ও মুখমন্ডল চ্যাপ্টা, চোয়াল উঁচু, চোখ ছোট ও টানা, চোখের মনি কালো এবং গায়ের রং হলুদাভ। এরা পূর্বে যাযাবর জীবনযাপন করতেন। এখনো তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বনজঙ্গল, পাহাড়-টিলা, ঝোপঝাড় তাদের অতিপছন্দ। ১৯৯১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী ১২,৩০০ খাসি বাংলাদেশে বাস করেন।

তারা বাঁশ বা কাঠের মাচার ওপর বাড়ি তৈরি করেন। বাড়ির সামনে কিছুটা জায়গা খোলা রাখেন, যা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বসত ঘরের সঙ্গেই থাকে রান্নার ঘর। প্রায় প্রতিটি বাড়ির কাছেই থাকে পালিত শূকরের খোঁয়াড়।



চিত্র: খাসিদের বাসস্থান



চিত্র:ঐতিহ্যবাহী সাজে খাসি নারী ও পুরুষ

অনেকগুলো খাসি পরিবার তাদের পছন্দের জায়গায় বসতি গড়ে তুলে। এটিকে ‘পুঞ্জী’ বলা হয়। প্রতিটি খাসি পুঞ্জী অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা এবং নিজস্ব সীমানা ও সাংস্কৃতিক বলয়ে গঠিত। তারা প্রায়ই এক পুঞ্জী ছেড়ে নতুন অঞ্চলে গিয়ে নতুন পুঞ্জী গড়ে তোলেন। পুঞ্জীর প্রধানকে ‘সিয়েম’ (মন্ত্রী) বলা হয়। তারা প্রধানত নিজেদের মধ্যে সংঘটিত কলহ-বিবাদের মীমাংসা করে থাকেন। এছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও তাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খাসি ধর্ম অনেক পুরাতন। ঐতিহ্যগত প্রথা ও বিশ্বাস তাদের ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে খাসিরা একেশ্বরবাদী। তবে এরা সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতি পূজারী। এদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। আধুনিককালে খাসি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমানে ৮০ শতাংশের মতো খাসি খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী। প্রায় প্রতিটি পুঞ্জিতেই গির্জা আছে।

খাসিদের কোনো বর্ণমালা নেই। এরা দ্বিভাষী। তারা খাসিয়া এবং বাংলা উভয় ভাষাই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারে পারদর্শী। শিক্ষিতজনেরা খাসিয়া ভাষা লিখতে বাংলা বর্ণমালাই ব্যবহার করে। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির প্রভাবে খাসিয়াদের ধর্মীয় অনুভূতি, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। তবে এদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে মাথায় চূড়াবাঁধা পাগড়ি পরা।



চিত্র: গৃহকাজে খাসি রমণী



চিত্র: ঐতিহ্যবাহী সাজে খাসি রমণী

খাসি নারী ও পুরুষের জন্য বিয়ে বাধ্যতামূলক। খাসিদের নিজস্ব গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। এ ধরনের বিয়ে হলে সামাজিক শাস্তি হিসেবে সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করে একঘরে করা হয় এবং মৃত্যুর পর কোনো অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয় না। ছেলেমেয়েরা বড় হলে পিতা-মাতা বিয়ের ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ বিয়েই মেয়ের তরফ থেকে পূর্ব সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। সাধারণত মেয়ে হরু বরকে নিজেদের বাড়িতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এভাবে তারা দুই-চারদিন একসঙ্গে বসবাস করার পরে ছেলে ও মেয়ের অনুকূল মতামতের ভিত্তিতে অভিভাবকবৃন্দ বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারণ করে থাকেন। এদের বিয়েতে ও

অন্যান্য উৎসবে নাচ ও সম্মিলিতভাবে গান গাওয়ার সাধারণ রীতি রয়েছে। বিয়ের পর বর কনের ভাই-বোনদের সাথে নিজের ভাই-বোনের মতো আচরণ করেন।

খাসি পরিবারে মেয়েদের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা অনেক বেশি। মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হয়। কনিষ্ঠা কন্যা রীতি অনুযায়ী মাতার বসতবাড়ি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। স্ত্রী আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা করেন। সঙ্গত কারণে স্ত্রীরা একাধিক বিয়ে করতে পারলেও পুরুষদের বহু বিবাহ বিরল। একে অপরের প্রতি ঘৃণা, অবিশ্বাস, স্বামীর অক্ষমতা ইত্যাদি নানা কারণে তালাক প্রচলিত। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে স্ত্রীরাই তালাক দিয়ে থাকে।

খাসি সমাজে চাষাবাদ ও গৃহস্থালির কাজ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহায়তা, সহযোগিতা ও মতামতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। এই সমাজে নারীর মর্যাদা ও সম্মান অনেক উঁচুতে। মায়ের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ পিতাকে দেখাশোনা করা সন্তানদের জন্য ধর্মীয় দায়িত্ব।

সাঁওতাল

বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হচ্ছে সাঁওতাল। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া অঞ্চলে সাঁওতালরা বসবাস করেন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে সাঁওতাল জনসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক।



চিত্র: সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী নাচ



চিত্র: সাঁওতালদের বসত বাড়ি

নৃতাত্ত্বিক বিচারে সাঁওতালরা আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো- অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর। সাঁওতালদের গায়ের রং কালো, মাঝারি উচ্চতা, কোঁকড়ানো কালো চুল, পুরু ঠোঁট, লম্বা গলা ও নাক প্রশস্ত।

সাঁওতালদের মাতৃভাষা ‘সাঁওতালি’। সাঁওতালি ভাষা অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতালদের ভাষা লেখার জন্য কোনো বর্ণমালা নেই। বর্তমানে তারা বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। ধ্বনিগত মিলের কারণে সাঁওতালিরা বাংলা বর্ণমালায় লিখতে সাচ্ছন্দবোধ করে। সাঁওতালদের কোনো লিখিত সাহিত্য নেই। তবে সাঁওতাল লোকগান ও লোকসাহিত্য সকলের কাছে সমাদৃত।

সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম থাকলেও কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। এরা ‘ঠাকুরজিউ’ (জীবনদাতা) কে সৃষ্টির দেবতা হিসেবে মান্য করে। এদের ধর্ম বিশ্বাসে ‘সিং বোঙ্গা’ (সূর্য দেবতা) ও ‘মারাং বুরু (গ্রেট মাউন্টেন)’ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালরা আত্মার অমরত্ব বা ‘বোঙ্গা’য় বিশ্বাস করে। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে সাঁওতালদের অগাধ বিশ্বাস।

সাঁওতাল সমাজে কেউ মারা গেলে মৃতদেহ গোসল করিয়ে পরে দাহ করা হয়। দেহভস্ম মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। বর্তমানে শব সমাধিস্থ করতেও দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য বিভিন্ন প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামের কেউ মারা গেলে গ্রাম প্রধানকে (মানঝি) সব আচার-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হয়।

সাঁওতালরা ১২টি গোত্রে বিভক্ত। একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে বর্তমানে এ নিয়ম ততটা কার্যকর নয়। সাঁওতাল সমাজ যদিও পুরুষশাসিত, তবে নারীদের ভূমিকাও কম নয়। সাঁওতাল সমাজে মাঝে মধ্যে বহুবিবাহ দেখা গেলেও একক বিবাহই প্রচলিত ধারা।

সাঁওতালদের ঘরগুলো খুব ছোট হলেও এদের আঙিনা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখা যায়। ঘরের মাটির দেয়ালে চিত্রকর্ম সাঁওতাল মেয়েদের শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে। এদের বাড়িঘর সাধারণত ছন ও খড়ের তৈরি। ঘরে কোনো জানালা থাকে না। বাঁশের চাটাই, খাটিয়া ও কাঁসার বাসন প্রধান আসবাবপত্র হিসেবে ব্যবহার করেন।

সাঁওতালরা নরম প্রকৃতির ও শান্তিপ্ৰিয়, কিন্তু খুবই পরিশ্রমী। এদের জীবনযাপন অত্যন্ত সাদামাটা, পোশাক-আশাকও খুবই সাধারণ। নারীরা মোটা ধরনের রঙিন শাড়ি খাটো করে পরিধান করেন, খোঁপায় চূড়া ফুল গুঁজতে পছন্দ করেন। পুরুষদের সাধারণ পোশাক হলো ধুতি ও গামছা। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অনেকেই আধুনিক পোশাকও পরিধান করেন। সাঁওতাল পুরুষ ও নারীরা প্রথাগতভাবে তাদের শরীরে উষ্ণি আঁকেন।

ভাত, মাছ ও সবজি সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য। এছাড়া কাঁকড়া, শূকর, মুরগি, গরু ও কাঠবিড়ালের মাংস এদের অতিপ্রিয়। পাট পাতা, হাঁস-মুরগির ডিম, বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং কচ্ছপ তাদের খাদ্য তালিকায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। ভাত থেকে চোলাই করা ‘হাঁড়িয়া’ বা পচাই এবং মছয়ার রস চোলাই করা মদ তাদের উৎসবে অপরিহার্য।

সাঁওতালরা উৎসবপ্রিয় জনগোষ্ঠী। এরাও বারো মাসে তেরো পার্বণ উদযাপন করে থাকে। সাঁওতালদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাস থেকে। জাঁকজমকপূর্ণ নাচ, গান ও বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে প্রায় প্রতি মাসেই বিভিন্ন রকম উৎসব পালিত হয়। শিয়ালসেই (Shialsei) উৎসব ফাল্গুন মাসে তারা নববর্ষ উৎসব হিসেবে উদযাপন করে। এছাড়া পৌষের শেষে ‘সোহরাই (ফসল তোলা)’, ফাগুন মাসে ‘বাহা (ফুল উৎসব)’, আষাঢ় মাসে ‘ইরক সিম (বীজ বপন উৎসব)’ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সোহরাই উৎসব শস্যদেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পালন করা হয়। এছাড়া মাখাসিম ও বসন্ত উৎসব উল্লেখযোগ্য।



চিত্র: সাঁওতালদের বাহা উৎসব

সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা কৃষি। সাঁওতালদের মাধ্যমেই এই উপমহাদেশে কৃষিব্যবস্থা ও কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির সূত্রপাত বলে অনেকেই মনে করেন। সাঁওতাল মেয়েরা খেত - খামারে কৃষিকাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একই সাথে তারা জীবিকা নির্বাহের অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেন। বর্তমানে এরা নানা পেশায় নিয়োজিত। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এরা গ্রামে বসবাস করে। বর্তমানে সাঁওতালরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে।

ওরাওঁ

বাংলাদেশে আনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে ওরাওঁ অন্যতম। এদের আদি বাসস্থান ভারতের উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, রাজমহল ও বিহারে। বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় এরা বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ওরাওঁ জনসংখ্যা ১১,২৯৬ (বাংলা পিডিয়া)। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australian) জনগোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ। এদের গায়ের রং কালো, নাক চ্যাপ্টা, চুল কালো ও কোঁকড়া, উচ্চতা মাঝারি।

ওরাওঁদের ভাষা ‘কুরুখ’ নামে পরিচিত। এ ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। এদের লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ। বাংলা বা ইংরেজি বর্ণে তাদের ভাষা লিখে থাকে।

ওরাওঁরা সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতির উপাসক। ‘ধর্মেশ’ যার অবস্থান সূর্যে, তাকে এরা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মনে করে। তাই তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অধিকাংশই সূর্যকে ঘিরে উদ্‌যাপিত হয়। এছাড়া ওরাওঁ সমাজ নানা দেবতায় বিশ্বাসী। ঐতিহ্যগতভাবে জাদুশক্তিতে বিশ্বাস প্রবল। বর্তমানে অনেকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ওরাওঁদের মৃতদেহ চিতার আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। বর্তমানে সমাহিত করার প্রচলন বাড়ছে।

অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতো ওরাওঁরা নাচ-গানের অনুরাগী এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাতে অভ্যস্ত। ঝুমুর গান এদের ঐতিহ্য সঙ্গীত। এছাড়াও ওরাওঁ সমাজে পার্বণভিত্তিক উৎসব যেমন- সারহুল (চৈত্র), ফাগুয়া, ভাদ্রী (ভাদ্র) উদযাপিত হয়ে থাকে।



চিত্র: ওঁরাওঁদের উৎসব



চিত্র: ওঁরাওঁ রমণী

ওরাওঁরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। তাদের সমাজে একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। ওরাওঁদের মধ্যে ছেলেমেয়ের মতামতের ভিত্তিতে পারিবারিকভাবে বিয়ের আয়োজন করা হয়। অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে এরা সমর্থন করেন না। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

এদের পোশাক অনাড়ম্বর। মেয়েরা মোটা শাড়ি এবং পুরুষরা ধুতি ও লুঙ্গি পরেন। ওরাওঁ মেয়েরা অলংকারপ্রিয়। ফুল তাদের সাজ ও শোভাবর্ধনের অঙ্গ। স্ত্রী-পুরুষ সবাই শরীরে উষ্ণি আঁকেন।

ওরাওঁদের প্রধান খাদ্য ভাত, শাকসবজি, মাছ ও মাংস। ঘরে তৈরি ‘পচাই’ এদের প্রধান পানীয়। সাধারণত ভাত পচিয়ে এই পানীয় তৈরি করা হয়। কৃষিকাজ ওরাওঁদের জীবিকার প্রধান উপায়। পুরুষ সদস্যরা হালচাষ করেন, অন্যান্য কাজে নারীরাই বেশি ভূমিকা রাখেন। পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি কর্মঠ।

শ্রো

শ্রো বাংলাদেশের আর একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এরা মুরং নামেও পরিচিত। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মুরংদের সংখ্যা ২২,১৬৭। সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে শ্রোরা আরাকান থেকে সরে এসে আলীকদমের বিভিন্ন পাহাড়ি উপত্যকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। উপজেলা সদর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে চিওনীপাড়া ও আমতলী এলাকায় এ সম্প্রদায়ের বসবাস। তা ছাড়া প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকা তৈন মৌজা, মাংগু মৌজা, চৈং মৌজা, চাইম্প্রা মৌজা, নৈফা মৌজা এবং তৈন খাল এলাকা ও মাতামুহুরী সন্নিহিত পাহাড়ি এলাকায় তাদের বসতি রয়েছে। তবে মাতামুহুরী নদীর তীরবর্তী পাহাড়ে তাদের বসবাস উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।

নিজস্ব ভাষা থাকলেও পূর্বে কোন বর্ণমালা ছিল না। বর্তমানে শ্রোদের ভাষার বর্ণমালা তৈরি হয়েছে। তাদের নিজস্ব ভাষায় ও বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে।

শ্রো সমাজ বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত। শ্রো সম্প্রদায়ের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। শ্রোরা তাদের ঘরে জীবজন্তুর মাথা ঝুলিয়ে রাখেন। একই গোত্র ও উপগোত্রের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ। শ্রো দম্পতির মধ্যে সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত। তবে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ।

শ্রো সম্প্রদায় মূলত প্রকৃতি পূজারী ও সর্বপ্রাণবাদী। তারা ইহকালকেই সর্বজ্ঞান করেন। তাদের মতে পরকাল বলতে কিছু নেই। শ্রোদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। তারা থুরাই (Thurai, বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা), সাংতুং (পাহাড় দেবতা) ও ওরেং (নদী দেবতা) এ বিশ্বাসী ও তাদের পূজা করে। শ্রোরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে।

শ্রো রা অত্যন্ত স্বল্পবসন পরিধান করেন। শ্রো পুরুষরা লেংটি এবং মেয়েরা ওয়াংলাই (সর্ট স্কার্ট) পরিধান করেন। নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করে থাকে। মেয়েরা পায়ে নূপুর, কোমরে বিছা পরে থাকেন। শ্রো নারীদের মতো ছেলেরাও মাথায় লম্বা চুল রাখে। নারী-পুরুষদের মাথায় চিরুনি গোঁথে রাখতে দেখা যায়। শ্রো মেয়েরা মাথায়, কানে ও খোঁপায় বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি ফুল গুঁজে রাখে। ছেলেরাও মাথার চুলকে খোঁপা আকারে বেঁধে রাখেন। নৃত্যানুষ্ঠান শ্রো সমাজে খুবই জনপ্রিয়। এ উপলক্ষে ছেলেমেয়েরা গালে, ঠোঁটে ও কপালে রঙের প্রলেপ লাগায়। নাচের আগে ১৫ থেকে ২০ জন মুরং যুবক-যুবতী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি রচনা করে।



চিত্র: শ্রোদের অনুষ্ঠান



চিত্র: শ্রো রমণী

এরপর তাদের তৈরি বাঁশির সুর ও বাজনার তালে তালে নৃত্য পরিবেশ করে থাকে। নাচে ও গানে বিবাহিত মেয়েদের অংশ নিতে দেয়া হয় না।

ভাত ও ঘরে তৈরি মদ তাদের প্রধান খাদ্য ও পানীয়। তারা কুকুর, গরু, ছাগল, গুরুর ও আরো কিছু বন্য প্রাণির মাংস খেতে অভ্যস্ত। ‘নাপ্লি’ তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার।

শ্রো নারী-পুরুষ কঠোর পরিশ্রমী। শ্রোদের প্রধান জীবিকা কৃষি। ‘জুম’ চাষ ও বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করা তাদের প্রধান পেশা। ফসল সংগ্রহের পূর্বে তারা মহা ধুমধামে ‘কুমুলং (গো বধ)’ উৎসব পালন করে। এ প্রধান উৎসবে যুবক-যুবতীরা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নাচ, গান করে এবং ঘরে তৈরি মদ পান করে থাকে।

বর্তমানে অধিকাংশ শ্রোরাই বৌদ্ধ, তবে কিছুসংখ্যক শ্রো খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এদের আদি বাসভূমি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের কুমিল্লা, সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় এদের কিছু অংশ বসতি স্থাপন করে। ত্রিপুরারা নিজেদেরকে ‘টিপরা’ বা ‘তিপারা’ নামে অভিহিত করেন। চট্টগ্রামের মোট ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৬.৬% ত্রিপুরা এবং তাদের সংখ্যা প্রায় ৭৯,৭৭২ জন (আদম শুমারি-১৯৯১)। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়, খাগড়াছড়িতেই প্রায় ৮০% ত্রিপুরাদের বসবাস।

ত্রিপুরারা সম্পূর্ণ অনার্য জাতি। মাঝারি গড়ন, উজ্জ্বল রং, বোচা নাক, ছোট ও তীক্ষ্ণ চোখ এবং কালো চুল এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। ত্রিপুরারা কক্-বরক ভাষায় কথা বলে। এ ভাষা বোডো শ্রেণিভুক্ত তিব্বতী-বার্মিজ গোত্রভুক্ত।



চিত্র : ঐতিহ্যবাহী গহনা ও পোশাকে ত্রিপুরা নারী



চিত্র: ত্রিপুরা দম্পতি

ধর্ম বিশ্বাসে ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মের অনুসারী। ত্রিপুরারা মোট ৩৬টি দল বা দফায় বিভক্ত, বাংলাদেশে ১৬টি দলের বসবাস রয়েছে। ত্রিপুরা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এদের সকল গোত্রের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত। এদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত। মৃত্যুর পর অস্ত্রোৎসর্গ হিসেবে তারা শবদাহক্রিয়া ও শ্রাদ্ধক্রিয়া পালন করে থাকে।

ত্রিপুরা পুরুষরা ‘ধুতি’ ও ‘খবন’ পরে। আর মহিলাদের প্রচলিত পোশাক হলো ‘পেটিকোট’ ও ‘ব্লাউজ’। মহিলারা নেকলেস, নোলক ছাড়াও গলায়, চুলের উপর, বাহুতে, হাতে অলঙ্কার ব্যবহার করে।

এরা পাহাড়ের ঢালে ৫ থেকে ১৫টি পরিবারে দলবদ্ধ হয়ে বাস করেন। তাদের বাড়িঘর বাঁশের তৈরি। ঘরগুলো ৫-৬ ফুট উঁচু। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তারা এভাবে ঘর তৈরি করেন। বর্তমানে অবশ্য অনেকে সমতলভূমিতে বসবাস করছেন।

জুম চাষ হলো ত্রিপুরা জাতির ফসল উৎপাদন পদ্ধতি। জুম চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা সঙ্গীত ও উৎসবের আয়োজন করে। ‘বৈশুক’ তাদের প্রধান সামাজিক উৎসব। তিন দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান চলে। বর্তমানে জুম চাষ ছেড়ে তারা সাধারণ চাষাবাদেও অভ্যস্ত হচ্ছেন।

অধ্যায় ১৩

অধিকার, দায়িত্ব ও মানবাধিকার

শিশু অধিকার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ শিশু। আজকের শিশু ভবিষ্যতের সক্রিয় নাগরিক হবে। তাই প্রয়োজন তাদের সুষ্ঠু সামাজিক, মানসিক ও অন্যান্য বিকাশ। এসব কিছুই নির্ভর করে শিশুদের উপযুক্ত পরিচর্যা ও বেড়ে ওঠার সুযোগ-সুবিধার উপর। আর তাই বিশ্বব্যাপী শিশুর অধিকার পূরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচিত হচ্ছে।

শিশুর জীবন অনেক ব্যাপারে বড়দের ওপর নির্ভরশীল। তার নিজের আয় নেই। ছোট বলে তার গায়ে জোর কম। একই কারণে তার জ্ঞানও কম। কিন্তু তাই বলে তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তার ওপর কোনো ব্যাপারে জোর খাটানো চলবে না। শিশুও কতগুলো ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। শিশু হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তারও কিছু অধিকার আছে। শিশুদের অধিকারের গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে এর কার্যকারিতা শুরু হয়।



বাংলাদেশ এ সনদের একটি স্বাক্ষরকারী দেশ। বাংলাদেশের সংবিধানেও বিভিন্নভাবে শিশু অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে প্রথম শিশু আইন প্রবর্তন করে। এছাড়া একটি উপযুক্ত শিশু নীতিও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকারি নীতি অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের সকলেই শিশু হিসেবে অভিহিত হবে।

বিভিন্ন ডকুমেন্ট অনুযায়ী শিশুদের অধিকারগুলো হলো:

শিশুদের অধিকার	
১) শিক্ষার অধিকার, ২) বেঁচে থাকা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার ৩) খাদ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসার অধিকার ৪) সম্পদের অধিকার ৫) স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পরিবেশে বসবাস ও কাজের অধিকার ৬) একটি নাম পাওয়ার ও জন্ম রেজিস্ট্রেশনের অধিকার ৭) ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকার ৮) শারীরিকভাবে নির্যাতিত ও যৌন হয়রানি না হওয়ার অধিকার ৯) শিশুশ্রমে জড়িত না হওয়ার অধিকার	১০) অল্প বয়সে বিয়ে না করার অধিকার ১১) খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকার ১২) ছেলে-মেয়ে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সবার সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার ১৩) আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ১৪) মা বাবার সাথে একসাথে বসবাসের অধিকার ১৫) অবৈধভাবে বিদেশে পাচার না হওয়ার অধিকার ১৬) তথ্য পাওয়ার ও মত প্রকাশের অধিকার ১৭) অবহেলা, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার শিশুদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার

এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্যেও অনেকগুলো বিধান রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা প্রধান হলেও বাবা-মার দায়িত্বও কিন্তু কম নয়। মোট কথা শিশুর জীবনধারণ, তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষা, নিরাপত্তা, চিন্তা, বিবেচনা, মত প্রকাশ ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা ইত্যাদি তার যত রকম অধিকার আছে সব রক্ষা করার দায়িত্ব বড়দের।

শিশুর অধিকার রক্ষায় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন, যা ভঙ্গ করলে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে কোনোভাবেই পূর্ণকালীন কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। (উৎস : বাংলাদেশিরা, Convention on the Rights of the Child, UNICEF, 1990)।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে এসব অধিকার বাস্তবায়নের পরিমাণ খুবই কম। এ লক্ষ্যে গৃহীত আইনগুলোর কার্যকারিতাও যৎসামান্য। ফলে আমাদের দেশের শিশুরা প্রতিনিয়ত তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি একদিকে যেমন শিশুর নিজের ক্ষতি করছে, অন্যদিকে শিশুর আদর্শ ও সক্রিয় নাগরিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এ অবস্থার উত্তরণ প্রয়োজন। শিক্ষকবৃন্দকে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার

শিশু অধিকার একটি সার্বজনীন বিষয়। শিশুর প্রতিটি অধিকার প্রত্যেক শিশুর পারিবারিক, সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা এবং পরিপূর্ণ সুখম বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিষয়টি অটিস্টিক ও অন্যান্য বিশেষ

চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অটিস্টিক শিশুর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক ধরনের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা। অটিস্টিক ও অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সাধারণ শিশুদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। ফলে তাদের অধিকার অনুধাবন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। পরিবার থেকে শুরু করে বিদ্যালয়, কমিউনিটি, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকল সন্ধ্যা জায়গায় যাতে এসব শিশু তাদের সকল ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার না হয়, গুরুত্ব সহকারে তা নিশ্চিত করতে হবে।



চিত্র: শ্রেণি কক্ষে অটিস্টিক শিশু

তারা যাতে মর্যাদা সহকারে সমাজে একজন উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এজন্য তাদের শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দিকের প্রতি আমাদের আন্তরিক ও যত্নশীল হতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমঅধিকার, মানবসত্তার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ ‘United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities, 2006’ অনুসমর্থন করে। ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে জাতিসংঘ সনদের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং সব ধরনের বৈষম্য হতে মুক্তি লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

এ আইনের ১৫ নং ধারার ১ নং উপধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে সকল আইনগত অধিকার লাভ করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে কিছু অধিকার তুলে ধরা হল:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনগত অধিকারসমূহ	
➤ পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা; ➤ সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা; ➤ স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি; ➤ প্রবেশগম্যতা; ➤ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণ; ➤ শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ; ➤ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়ুক্তি	➤ নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধা প্রাপ্তি; ➤ প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি; ➤ শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সহ প্রয়োজ্য সকল ক্ষেত্রে ‘প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগসুবিধা’ (reasonable accommodation) প্রাপ্তি; ➤ শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যথাসম্ভব বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ; ➤ শারীরিক, মানসিক ও কারিগরী সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে

এছাড়া উপধারা (২) এ বলা হয়েছে যে, কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোন প্রকারের বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যাপারে এ আইনের ৩২ নং ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, “প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না”। একই সাথে উপধারা নং ২ এ বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবে বলে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

অপর দিকে, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা, তাদের বেড়ে উঠা, নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন, সামাজিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের জন্য যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার তথা মূলধারার বিদ্যালয় বা অবস্থাভেদে বিশেষায়িত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয় বরং আন্তর্জাতিক ভাবে বাংলাদেশ বেশ স্বার্থকতার সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে অটিজম সহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার কারণে উদ্ভূত এবং বৃদ্ধি পাওয়া বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অবদান রাখছে।

আজকের শিশু জাতির সোনালী ভবিষ্যতের স্থপতি। সুন্দর কল্যাণকর জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ স্থপতিগণ সকল সম্ভাবনাসহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে।



চিত্র: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য এরূপ একটি পরিবেশ গঠন করতে হলে তাদেরকে কারো অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করা যাবে না। এজন্য প্রয়োজন এ ধরনের শিশুদের অধিকার পূরণে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় আরও আইন প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের সম্মিলিত ও কার্যকর উদ্যোগ।

বাল্য বিবাহ ও আমাদের করণীয়

বাল্যবিবাহ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের পরিপন্থী এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিরোধী। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাল্য বিবাহ আইন সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও অসচেতনতা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে সমস্যাটি সমাজে বিদ্যমান। এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রচার ও প্রয়োগের অভাবও সমস্যাটির অন্যতম কারণ। বাল্যবিবাহ, এর ক্ষতিকর দিক ও এর আইনগত দিকগুলো সম্পর্কে সকলের জানা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বর্তমান বিবাহ আইন অনুযায়ী বিয়ের সময় যদি পাত্রের বয়স ২১ বছরের নিচে এবং কনের বয়স যদি ১৮ বছরের নিচে হয়, তখন তাদের বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেআইনী।

বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক

বাল্যবিবাহের ফলে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্নভাবে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিকর দিকগুলো হলো:

- এ বয়সের সহজাত উচ্ছ্বাস-বৃদ্ধি ও গতিশীলতাকে থামিয়ে দেয়।
- দ্রুত শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে, ফলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে না।

- অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভ ধারণের ফলে মেয়েদের অপুষ্টি ও গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়। এমনকি প্রসবকালে মা ও শিশুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- শিশুর স্বল্প ওজন হয় ও অপুষ্টিতে ভুগে জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- সংসারের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অপরিপক্ক হওয়ায় দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয় ও নারীরা অধিক মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হয়।
- বাল্য বিবাহের ফলে অল্প বয়সী মেয়ে তালুকপ্রাপ্ত হলে তার পরিবার আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- অত্যাচারিত হয়ে অনেক মেয়ে বিপথে চলে যায়, এমনকি আত্মহত্যার মত অপরাধের পথ বেছে নেয়।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

বাল্যবিবাহের মত একটি সামাজিক সমস্যাকে প্রতিহত করতে আমাদেরকে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

- জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে বিয়ের সময় জন্ম সনদ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- কিশোরী ও নারীদের সচেতনতার পাশাপাশি পরিবার-সমাজকে সচেতন করতে হবে।
- কাজী ও ইমামদের বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও আইনগত বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বর বিশেষ করে নির্বাচিত নারী মেম্বরগণ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবাইকে সচেতন করবে।
- বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে সমাজের সকলকে সচেতন করতে হবে।
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাল্যবিবাহের আইন

বাল্যবিবাহ হল অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক বিবাহ। আইনত বিয়ের বয়স ১৮ বৎসর, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে অভিবাবকের অনুমতি সাপেক্ষে এই বয়সের আগেও বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়। যদিও আইন অনুযায়ী বিয়ের বয়স ১৮ বৎসর, তারপরও কিছু কিছু দেশের নিজস্ব প্রথাকেই আইনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বাল্যবিবাহে মেয়ে এবং ছেলে উভয়ের উপরই প্রভাব পড়ে। তবে মেয়েরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষত নিম্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কারণে। বেশিরভাগ বাল্যবিবাহে দুজনের মধ্যে শুধু একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। বিশেষত মেয়েরাই বাল্যবিবাহের শিকার বেশি হয়।

“বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী বাল্যবিবাহ অর্থ এইরূপ বিবাহ যাহার কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ (আঠারো) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো নারী”।

বাল্যবিবাহের শাস্তি

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী -

“৭। বাল্যবিবাহ করিবার শাস্তি

(১) প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৮ এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দণ্ড প্রদান করা হইলে উক্তরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৮। বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি

পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোন কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্থায়ী অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যান্য ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিবার শাস্তি

কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যান্য ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধনের শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল

কোন বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যান্য ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তাহার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “বিবাহ নিবন্ধক” অর্থ Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিকাহ রেজিস্ট্রার এবং Christian Marriage Act, 1872 (Act No. XV of 1872), Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক।”

নাগরিক অধিকার

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। মূলত একটি রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝা সম্ভব হয় ঐ রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কতটুকু অধিকার দিচ্ছে তার মাধ্যমে। রাষ্ট্র কতটুকু জনকল্যাণকর তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কী পরিমাণ ভোগ করে তার উপর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাক্সিঁর মতে, “প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিতি পায় তার প্রদত্ত অধিকার পরিচর্যা ও লালন-পালন দ্বারা” (ভুইয়া, ১৯৯৭)। প্রচলিত অর্থে অধিকার হলো মানুষের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা। কিন্তু ক্ষমতা ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত দাবি। ক্ষমতা তখনই অধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে যখন রাষ্ট্র ঐ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয়। অধিকারের বিষয়টি সর্বজনীন। মূলত সমাজের উন্নতি, কল্যাণ সাধন এবং ধারাবাহিকতা রক্ষায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অধিকার পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করে থাকে।

নাগরিক অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

বৃহৎ অর্থে নাগরিক অধিকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো: ক) সামাজিক অধিকার, খ) রাজনৈতিক অধিকার ও গ) অর্থনৈতিক অধিকার। নিম্নে বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

সামাজিক অধিকার

সামাজিক অধিকার সমাজ জীবনের জন্য অপরিহার্য। সামাজিক অধিকারের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক জীবনযাপন ও জীবন সংরক্ষণ করে থাকে। নাগরিকের সামাজিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ:

১. **বঁচে থাকার অধিকার** : ব্যক্তির জীবন রক্ষার অধিকার সব অধিকারের মূল। ব্যক্তি জীবিত না থাকলে অন্য অধিকারের কোনো অর্থ হয় না। এ কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিকট তার নাগরিকের জীবন রক্ষার অধিকার একটি মৌলিক সামাজিক অধিকার।
২. **সম্পত্তির অধিকার** : প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের নিশ্চয়তা লাভের অধিকার আছে। সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। এ কারণে রাষ্ট্র তার নাগরিকের সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করে থাকে।
৩. **স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার** : প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র যদি কোনোভাবে নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরা বাধাগ্রস্ত করে তাহলে ঐ অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।
৪. **সংঘবদ্ধ হবার অধিকার** : নাগরিকের সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা সামাজিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। নাগরিক সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করে থাকে।
৫. **মত প্রকাশের স্বাধীনতা** : মনের ভাব প্রকাশের অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বিভিন্নভাবে নাগরিক মত প্রকাশ করতে পারে। মত প্রকাশের অধিকারের মাধ্যমে নাগরিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করে থাকে।
৬. **সংবাদপত্রের অধিকার** : সংবাদপত্রের অধিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে মূলত নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারকে শক্তিশালী করা হয়।

৭. সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার : ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চা ও সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়; বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসরত প্রত্যেকটি নাগরিককে সংস্কৃতি ও ভাষার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করবে না।

৮. ধর্মের অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকের তার নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র এমন কিছু করবে না যাতে করে নাগরিকের অনুভূতিকে আঘাত করে।

রাজনৈতিক অধিকার

রাজনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নাগরিকগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে তাই রাজনৈতিক অধিকার। নিচে রাজনৈতিক অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. ভোটদানের অধিকার : ভোটদানের অধিকার রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। এই অধিকার অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের মাধ্যমে পছন্দমতো সরকার গঠন করবে।
২. নির্বাচনের অধিকার : এই অধিকার অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষ নির্বাচন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
৩. সরকারি চাকরি লাভের অধিকার : নির্দিষ্ট যোগ্যতা অনুযায়ী নাগরিকের চাকরি লাভের অধিকার রয়েছে। চাকরি লাভের মাধ্যমে নাগরিক সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
৪. বিদেশে নিরাপত্তার সুযোগ : বিদেশে অবস্থানকালে নাগরিকের নিজ রাষ্ট্রের নিকট থেকে সাহায্যের দাবি করার অধিকার রয়েছে।

অর্থনৈতিক অধিকার

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকারকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। অনেকেই মনে করেন নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. কর্মের অধিকার : রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিকের কাজ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। মূলত কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।
২. পর্যাপ্ত মজুরির অধিকার : নাগরিক তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং কর্ম অনুযায়ী পর্যাপ্ত মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। নাগরিক যেন কোনোভাবে মজুরি বৈষম্যের শিকার না হয় সেদিকে রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. কর্মের যৌক্তিক সময়ের অধিকার : নাগরিকের দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করার অধিকার রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের স্বীকৃত ব্যবস্থা রয়েছে।

নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধিকারের পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রব্যবস্থা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক কর্তব্য রয়েছে যেগুলো আইন কর্তৃক অনুমোদিত এবং এই কর্তব্যসমূহ পালন না করলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। নিচে নাগরিকের প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করা হলো।

১. **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য :** নাগরিকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে নাগরিক অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষায় সহায়তা করে থাকে।
২. **আইন মান্য করা :** রাষ্ট্রের আইন মানা নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন অমান্য করলে নাগরিককে শাস্তি পেতে হয়। মূলত রাষ্ট্রের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়। দেশের আইন মান্য করাকে সমাজ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৩. **কর প্রদান :** রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে আয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করতে হয়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত সময়মত কর প্রদান করা।
৪. **ভোটদান করা :** প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। ‘সততা’ ও ‘নিষ্ঠার’ সাথে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
৫. **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা :** দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যেক নাগরিকের উচিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন অনুযায়ী সার্বিক সহায়তা প্রদান করা। আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল থাকলে নাগরিকগণ সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে।
৬. **অন্যায়ের প্রতিবাদ করা :** সমাজের বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ করাও নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যায়ের প্রতিবাদের মাধ্যমে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।
৭. **সহিষ্ণুতা প্রদর্শন :** নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা। প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্বসহকারে শোনা এবং যৌক্তিক মতামতকে গ্রহণের মানসিকতা থাকা।

রাষ্ট্রের সূনাগরিক হতে হলে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এগুলো আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে একইভাবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে।

মানবাধিকার

মানুষ হিসেবে আমাদের সবার সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এ জন্য আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দরকার হয়। যেমন-শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা, স্বাধীনভাবে চলাচলের সুযোগ। মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারগুলোকে বলা হয় মানবাধিকার। মানবাধিকার হলো সেইসব অধিকার যা নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে এবং যা অর্জিত হলে সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিকশিত হতে পারে। একজন মানুষ সে যেকোনো সমাজে-রাষ্ট্রে-পরিবারে-শ্রেণিতে-লিঙ্গে-সম্প্রদায়ে-ধর্মে-জাতিগোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, এই অধিকারগুলো তার ন্যায্য পাওনা। কেউ এগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। এগুলো পাওয়ার ব্যাপারে কারো উপর কোনো শর্ত আরোপ করা চলবে না, কারো বেলায় এগুলো কমানো-বাড়ানোরও অবকাশ নেই।

বিশ্বের মানুষের কতগুলো অভিন্ন অধিকার আছে, যাকে মৌলিক মানবাধিকার বলে। যেমন-সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার, শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, বিচার পাওয়ার অধিকার, নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তা লাভের অধিকার, নিজের মত প্রকাশের অধিকার, সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি। মানবাধিকার একটি সর্বজনীন অধিকার। এটি মানুষের এমন কিছু সহজাত অধিকার যা ছাড়া মানুষের সত্যিকার বিকাশ সাধন হয় না। মানবাধিকারকে মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকার সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্গত। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ‘মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায়’ (The Universal Declaration of Human Rights) বর্ণিত অধিকারগুলো বর্তমানে ‘মানবাধিকার’ হিসেবে খ্যাত। ৩০টি অনুচ্ছেদে সংবলিত এই ঘোষণায় মোট ২৫টি মানবাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তার মধ্যে ১৯টি নাগরিক ও রাজনৈতিক এবং অন্য ৬টি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কিত অধিকার। এর মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৭টি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (মণ্ডল ও মণ্ডল, ১৯৯৯)। নিচে প্রধান প্রধান মানবাধিকার বর্ণনা করা হলো :

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

বিভিন্ন মানবাধিকার সনদে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে মানবাধিকারের অন্যতম অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মূল বক্তব্য হলো- জাতি, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের বেশ কিছু নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অধিকার হলো :

ক) জীবন রক্ষার অধিকার, খ) নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ হতে মুক্তি, গ) দাসত্ব ও বাধ্যতামূলক শ্রম হতে মুক্তি, ঘ) স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার, ঙ) আটক ব্যক্তির মানবিক আচরণ পাবার অধিকার, চ) ঋণের দায়ে কারাবাস না থাকার স্বাধীনতা, ছ) চলাচল (বা স্থানান্তর) এবং নিবাস পছন্দের স্বাধীনতা, জ) রাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশিদের খামখেয়ালিভাবে বহিস্কৃত না হবার স্বাধীনতা, ঝ) নিরপেক্ষ বিচার পাবার স্বাধীনতা, ঞ) পূর্ব থেকে কার্যকর বলে পরে ঘোষিত কোনো অপরাধ আইন থেকে রক্ষা পাবার অধিকার, ট) আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার অধিকার,	ঠ) গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, ড) চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, ঢ) মতামত দান ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ণ) গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় ঘৃণা উদ্বেককারী প্রচারণার উপর বিধি-নিষেধ, ত) সমবেত সংগঠন করার অধিকার, থ) সংগঠন করার স্বাধীনতা, দ) বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার, ধ) শিশুদের অধিকার, ন) রাজনীতি করার অধিকার, প) আইনের দৃষ্টিতে সমান, ব) সংখ্যালঘুদের অধিকার
---	---

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার মূলত মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মর্যাদার জন্য অপরিহার্য। সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা পাবার অধিকার রয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব

হলো তার নাগরিকের মর্যাদা রক্ষায় দায়িত্ব নেয়া। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে সর্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই মানবাধিকারের মধ্যে বিভিন্ন অধিকার অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো হলো : কাজের অধিকার, কাজের যথার্থ ও অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও এতে অংশগ্রহণের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার, পরিবার সংরক্ষণ এবং মা ও শিশুর সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার, জীবনযাত্রার যথাযথ মান উপভোগের অধিকার, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রাপ্য সর্বোচ্চ মান উপভোগের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার এবং এই অধিকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের সুযোগলাভের অধিকার।

দলীয় অধিকার

বিভিন্ন দলীয় অধিকারসমূহ মানবাধিকারের অন্যতম স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয় (আইন-শালিস কেন্দ্র, ১৯৯৮)। এই সমস্ত দলীয় অধিকারের মধ্যে নারীর অধিকার, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকার, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার, সংখ্যালঘু ভাষিকের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, অভিবাসন শ্রমিকের অধিকার, প্রতিবন্ধীর অধিকার, সংখ্যালঘু যৌনকর্মীর অধিকার, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকার এবং বন্দির অধিকার উল্লেখযোগ্য। মূলত মানবাধিকারের মাধ্যমে এই সমস্ত দলের একদিকে যেমন মানুষ হিসেবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে মানুষ হিসেবে সমাজে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ও সমস্ত বৈষম্য নিরসনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মানবাধিকার সংরক্ষণে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

যদিও মানবাধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, তবুও মানবাধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে সে জন্য নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ, কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে, অন্যদিকে অন্যের মানবাধিকার সংরক্ষণে ব্যক্তি নিজে কোনো প্রতিবন্ধকতা না সৃষ্টি করে সে ব্যাপারেও সচেতন থেকে মানবাধিকার সংরক্ষণে সার্বিক ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসমূহ অনুমোদন ও স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানেও মানবাধিকারের বিভিন্ন অধিকারসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও ইউএন প্যারিস নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে ২০০৯ সালে সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করেন (জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ২০১০)। বর্তমানে এই কমিশন মানবাধিকার সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

তবে মানবাধিকার সংরক্ষণে নাগরিক সমাজের কার্যকর ভূমিকা অপরিহার্য। যদি প্রতিটি নাগরিক অন্যের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করে তাহলে প্রতিটি নাগরিকের যে মানবাধিকার রয়েছে তা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব। নিচে মানবাধিকার সংরক্ষণে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করা হলো—

১. মানবাধিকার সংস্কৃতি উন্নয়নে সহায়তা করা

নাগরিকের মানবাধিকার সংরক্ষণে মানবাধিকারবান্ধব সমাজ গঠন করা প্রয়োজন। সমাজে যদি মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে না ওঠে তাহলে শুধু আইন প্রণয়ন করে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা কঠিন। মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার জন্য নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক। একটি দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক মানবাধিকারের ইস্যুসমূহের সাথে যদি পরিচিত না হয় তাহলে মানবাধিকারের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না।

২. সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে ডায়ালগ ও পার্টনারশিপে অংশগ্রহণ করা

মানবাধিকারের বিষয়টি একটি যৌথ প্রচেষ্টা। কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা রাষ্ট্র এককভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে না। প্রত্যেকটি নাগরিক, সংগঠন, ও সরকারের সমন্বিত এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ডায়ালগ ও পার্টনারশিপের। নাগরিক হিসেবে একজন ব্যক্তির উচিত এই ডায়ালগ এবং পার্টনারশিপ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

৩. মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা

মানবাধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন মানবাধিকার বিষয়ক আইন রয়েছে। প্রত্যেকটি নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ঐ সমস্ত আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মানবাধিকার সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করা।

৪. মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া

প্রত্যেক নাগরিক যদি মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন হয় তাহলে মানবাধিকার সংরক্ষণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যসূচিতে অংশগ্রহণে নিজেকে সক্রিয় হতে হবে।

৫. সমাজে গণতান্ত্রিক চর্চা ও উন্নয়নে সহায়তা করা

মানবাধিকার সংরক্ষণে সমাজের গণতান্ত্রিক চর্চার ধারা অব্যাহত রাখা জরুরি। গণতন্ত্রকে মানবাধিকারের অন্যতম ভিত্তি বলে মনে করা হয়। যে সমাজ যতটা গণতান্ত্রিক সে সমাজ ততটা সভ্য। অন্যদিকে সভ্যতা মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় সূচক।

৬. মানবাধিকার ডিফেন্ডারের পক্ষে ও সহিংসতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া

প্রত্যেক নাগরিকের উচিত মানবাধিকার যেই লঙ্ঘন করুক না কেন তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং তার প্রতিবাদ করা এবং সহিংস আচরণের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে অবস্থান নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে সাহস যোগানো ও মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়তা করা।

৭. মুক্ত ও স্বাধীন মিডিয়া তৈরিতে সহায়তা করা

মানবাধিকার সংরক্ষণে মুক্ত ও স্বাধীন মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মুক্ত ও স্বাধীন মিডিয়া গঠনে অব্যাহত সহায়তা প্রদান।

৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা

প্রতিটি সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাস করে। মুসলমান বাংলাদেশে প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী হলেও এখানে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু যেমন-হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদির বসবাস রয়েছে। ফলে প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এই সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তাদের মানবাধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা।

৯. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নারীর প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন হয়ে বৈষম্য নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা রাখা।

১০. অন্যের মতামতে শ্রদ্ধাশীল থাকা

প্রত্যেক নাগরিক অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে তারা মানবাধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ব্যক্তি যখন অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলবে তখন সমাজে সহিংসতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে।

১১. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া

বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। এদের অনেকের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে এদের মানবাধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া। এর ফলে তাদের মানবাধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব।

অধ্যায় ১৪

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা

বর্তমান বিশ্বে ১৯৬টি দেশ রয়েছে। এসকল দেশগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও নানামূখি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং নিজেদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি দেশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অন্যের সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও একটি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, ওআইসি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তেমনি আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সার্ক, আশিয়ান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আফ্রিকান ইউনিয়ন, এপেক ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান অধ্যায়ে জাতিসংঘ এবং সার্ক সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

জাতিসংঘ

জাতিতে জাতিতে সংঘাত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রাকে বারবার ব্যাহত করেছে। বিশেষ করে গত শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ধ্বংসের ব্যাপকতা এবং ভয়াবহ পরিণতি দেখে বিশ্বের মানুষ যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিশ্ববাসী এ ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছিল। বিশ্বনেতৃবৃন্দ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা এবং সকলের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি ‘লিগ অব নেশনস’ গঠন করেন। বিভিন্ন কারণে এই সংস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়লে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।



চিত্র: জাতিসংঘের সদর দপ্তর

এ যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানুষের বিবেককে পুনরায় নাড়া দেয় এবং মানবসভ্যতা রক্ষাকল্পে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি রাষ্ট্রের সম্মুখে এক সনদ বা চার্টার স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩ (সূত্র : <http://www.un.org/en/ga/>)। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৭তম সদস্য।

জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত জাতিসংঘের প্রধান ৪টি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো—

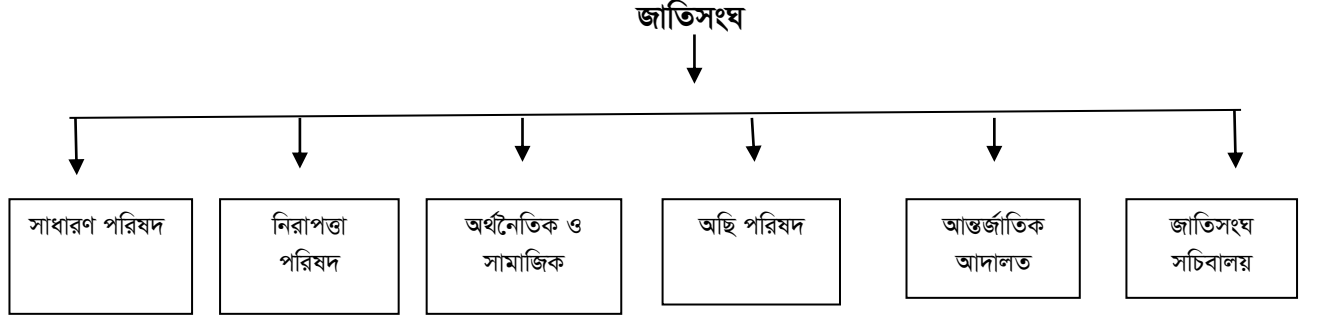
১. সারা বিশ্বের শান্তি বজায় রাখা;
২. সকল জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করা;
৩. দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাদি ও অশিক্ষা দূরীকরণ এবং পরস্পরের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে প্রত্যেক জাতিকে একত্রে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং
৪. এ সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন জাতির কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য চার্টার বা সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের কতকগুলো নীতি রয়েছে। এ নীতিগুলো হলো—

- সকল সদস্য রাষ্ট্রকে জাতির মর্যাদা দিতে হবে;
- সনদ অনুযায়ী সকল সদস্য রাষ্ট্রই গৃহীত দায়িত্ব পালন করবে;
- আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্র মিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকবে;
- কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করবে না;
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রই বল প্রয়োগ করবে না;
- বর্তমান চার্টার অনুযায়ী জাতিসংঘ যেকোনো দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে সকল রাষ্ট্রই যথারীতি সাহায্য করবে; এবং
- জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন সকল রাষ্ট্রও যাতে জাতিসংঘের নির্দেশ মেনে চলে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

জাতিসংঘের গঠন

জাতিসংঘ প্রধানত নিম্নরূপ ৬টি সংস্থা বা বিভাগ নিয়ে গঠিত। নিম্নের ছকে সেগুলো দেখানো হলো:



জাতিসংঘের অঙ্গীভূত সংস্থাসমূহের গঠন, কাজ এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে সংস্থাসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো—

ক) সাধারণ পরিষদ

জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদের সদস্য। সকল সদস্য রাষ্ট্রই কোনো ইস্যুতে মাত্র ১টি করে ভোটদানের অধিকার রাখে। সাধারণ পরিষদের নিয়মিত সভা সাধারণত প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে একাধিক সভাও অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রতি অধিবেশনের শুরুতেই সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি নির্বাচিত হয়ে সভার কাজ পরিচালনা করেন। যেকোনো প্রস্তাব পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। এই পরিষদ প্রধানত মহাসচিব নিয়োগ, জাতিসংঘের বাজেট পাস, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা, সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা নির্ধারণ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন, অন্যান্য সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা, নতুন সদস্য গ্রহণ এবং শর্ত ভঙ্গের কারণে কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে বহিষ্কার ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এ পরিষদ করে থাকে।

খ) নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগ ৫টি স্থায়ী সদস্য ও ১০টি অস্থায়ী সদস্যসহ মোট ১৫টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে প্রতি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন। নিরাপত্তা পরিষদে ওঠার মতো যেকোনো প্রস্তাবের সাথে এই ৫টি রাষ্ট্র দ্বিমত পোষণ করলে সেটি আর অনুমোদিত হয় না। এ ক্ষমতাকে বলা হয় ভেটো।

বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব এই পরিষদের ওপর ন্যস্ত। এই পরিষদ দ্বন্দ্বের রত দেশগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা, সালিসী, মধ্যস্থতা বা আপোস মীমাংসার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। কোনো বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করে। প্রত্যেক সদস্য একটি করে ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে। সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বছরে কমপক্ষে ২ বার নিউইয়র্ক কিংবা জেনেভায় এই পরিষদের অধিবেশন বসে। এই পরিষদের প্রধান কাজ হলো সদস্য দেশগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষায় প্রসার ঘটানো, মানবাধিকার কার্যকর করার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন। এছাড়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করাও এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

ঘ) অছি পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত। এই পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চল ও শাসনকার্যের দিক থেকে বিশৃঙ্খল দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের দেশ শাসনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের কাজ।

ঙ) আন্তর্জাতিক আদালত

১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক আদালত হলো জাতিসংঘের বিচারালয়। বিচারকদের চাকরিকাল ৯ বছর। নেদারল্যান্ডসের রাজধানী ‘দি হেগ’ শহরে এটি অবস্থিত।



চিত্র: আন্তর্জাতিক আদালত ভবন

জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র যে কোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য এই আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারে। এই আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কার্যকরী করা হয়।

চ) জাতিসংঘ সচিবালয়

জাতিসংঘ সচিবালয় হলো জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। মহাসচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এটি গঠিত। মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। জাতিসংঘ সচিবালয় তার অন্তর্ভুক্ত ৯টি বিভাগের মাধ্যমে সকল প্রশাসনিক কাজগুলো পরিচালনা করে থাকে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

মূলতঃ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বে বিরাজমান নানা সমস্যা সমাধানে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে জাতিসংঘের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসংশিত হয়েছে। আবার কখনো কখনো জাতিসংঘের কিছু পদক্ষেপ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সমালোচিতও হয়েছে। বিশ্ববাসীকে যুদ্ধভয় থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, বিবদমান দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, অকার্যকর চুক্তির পরিবর্তন, বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আইনের পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নতি, প্রগতি এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘ তার শান্তি রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘের বিশ্ব শান্তি রক্ষীবাহিনীর সদস্য হিসেবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বীরত্ব ও প্রশংসার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বার্থ, শিক্ষা, শ্রম, মানবাধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিরলস কাজ করে আসছে যা প্রশংসার দাবিদার। বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মোকাবেলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবকল্যাণে শক্তিশালী ভূমিকা রেখে চলেছে। মোট কথা বিশ্বব্যাপী সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র এবং দুর্বল দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘ তার অঙ্গীভূত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ, জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, মানবাধিকার বাস্তবায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতিসংঘের অঙ্গীভূত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা

বিশ্বের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিধানের যে অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করেছিল সেই যাত্রাকে বেগবান করতে জাতিসংঘ কিছু বিশেষায়িত সংস্থা গঠন করেছে। নিম্নে জাতিসংঘের কয়েকটি অঙ্গীভূত সংস্থার কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF)

এই সংস্থা বিশ্বকে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় আবাস হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন দেশের সরকার, সম্প্রদায় ও পরিবারকে সাহায্য করে। ১৯৪৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের একমাত্র সংস্থা ইউনিসেফ যা শিশু ও নারী অধিকার নিশ্চিত করতে একাত্মভাবে নিবেদিত। ইউনিসেফের শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়স্ক সকলেই শিশু হিসেবে বিবেচিত।



চিত্র: ইউনিসেফ সদর দপ্তর

ইউনিসেফ ১৬১টি দেশে কাজ করে। সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত করা, শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ও মৃত্যুবুঁকি কমাতে সহায়তা, গর্ভধারণ ও শিশুজন্ম নিরাপদ করা, লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিহত করা, মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সমাজকে সচেতন করা, কিশোর-কিশোরীদেরকে সমাজে যোগ্য নাগরিক হিসেবে টিকে থাকার জন্য দক্ষতা অর্জনের সহায়তা করা ও তাদের বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদান যেমন দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহায্য দিয়ে শিক্ষায়তন পুনরায় চালু ও শিশুদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল নিশ্চিত করাও ইউনিসেফের কাজ। ইউনিসেফ মানবসেবামূলক কাজের জন্য ১৯৬৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

মানবজাতির মানবতা, বিচার-বুদ্ধি, চিন্তা ও নৈতিক সংহতির ওপর ভিত্তি করে বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি গড়ে তোলার জন্য ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।



চিত্র:ইউনেস্কো সদর দপ্তর

বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৯। এই সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন এ ৪টি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো শান্তি ও মানব সংস্কৃতির বিকাশসাধন এবং উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা। সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন, আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ-গবেষণার উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লালনে সহায়তা, বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার প্রসার, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই সংস্থা বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। দুই বছর পর পর ইউনেস্কোর পরিচালনা সভায় সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সাধারণ সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর অগ্রগতি তদারক করে।

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর এ সংস্থায় যোগদান করে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন গঠন করে। এটি বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে। ইউনেস্কো বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ বয়স্ক শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগেই বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (যেমন বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার) সংরক্ষণেও ইউনেস্কোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization, WHO)

১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এ সংস্থাটির সদর দপ্তর অবস্থিত।



চিত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর

১৯১টি রাষ্ট্র এর সদস্য। বছরে একবার এর সভা বসে। এর প্রধানকে বলা হয় মহাপরিচালক। এ সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসমূহের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করার চেষ্টা চালায়। বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করাই এ সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য WHO নিম্নলিখিত কাজগুলো করে থাকে।

- দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতিরিক্ত মৃত্যুহার, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রতিবন্ধিত্ব হ্রাস করা।
- সুস্থ জীবন বিকাশের পথে স্বাস্থ্যের ওপর পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আচরণগত যে হুমকির সৃষ্টি হয় তা কমিয়ে আনা।
- এমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো যা সুশ্রম ও কার্যকর, আর্থিক বিবেচনায় ন্যায্য ও সহজপ্রাপ্য।
- যথাযথ স্বাস্থ্য নীতি গ্রহণ ও এর বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ তৈরি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও উন্নয়ন নীতিতে স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব প্রদান।

WHO বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এদেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এদেশের শিশুদের ৬টি মূল রোগ (যথা ডিপথেরিয়া, হাম, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি) দূরীকরণে ও প্রতিরোধে WHO বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া এদেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু কমানোর জন্যও সংস্থাটি কাজ করছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Program, UNDP)

এ সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং জাতিসংঘের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে থাকে। সংস্থাটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের জন্য বছরে মোট ২৩০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদ দিয়ে থাকে। এটি জাতিসংঘের সবচেয়ে বৃহৎ উন্নয়ন সহায়তাকারী সংস্থা।



চিত্র: ইউএনডিপি সদর দপ্তর, নিউইয়র্ক

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই সংস্থা সম্পদ ও সহযোগিতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের জন্য সকল অংশীদারদের নিয়ে একযোগে কাজ করে থাকে। রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন ও টেকসই মানব সম্পদ উন্নয়ন নিয়ে এই সংস্থা বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ইউএনডিপির সদর দপ্তর অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ((International Labour Organization, ILO)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জাতিসংঘের সেই বিশেষায়িত সংস্থা যা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও শ্রমিক-অধিকারের উত্তরণের প্রচেষ্টায় কাজ করে।



চিত্র: আইএলও সদর দপ্তর

আইএলও আন্তর্জাতিক নীতিমালা তৈরি ও কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমমান গড়ে তোলে, যা এসব নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। এসব নীতিকে কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সরকারকে কারিগরি সহযোগিতার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা এবং এসব কর্মসূচির সার্থক বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে আইএলও সহায়তা করে।

আইএলও শ্রম প্রসঙ্গে যেকোনো নীতি নির্ধারণ ও প্রণয়নে সরকারের সাথে শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর সদর দপ্তর জেনেভায় অবস্থিত।

বিশ্ব ব্যাংক (World Bank, WB)

বিশ্ব ব্যাংক হচ্ছে ৫টি প্রতিষ্ঠানের একটি গোষ্ঠী। দরিদ্র দেশসমূহের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস করাই হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লক্ষ্য। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সহায়তা দান।



চিত্র: বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তর

প্রত্যেক সদস্য দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক বিশ্ব ব্যাংক পরিচালিত হয়। এর প্রধানকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট এবং সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC)



সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠন। এর পুরো নাম South Asian Association for Regional Cooperation। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্ক গঠিত হয়। দেশগুলো হলো-বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান এর সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা হলো ৮। এছাড়াও সার্কের সাত পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হলো-চীন, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান।

সার্ক গঠনের পটভূমি

দক্ষিণ এশিয়ায় পৃথিবীর কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ অবস্থিত। দেশগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনুন্নয়ন ইত্যাদি এসব দেশের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক কল্যাণের মাধ্যমে দেশগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হয়।

সার্ক গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বপ্রথম অনুভূত হয় ১৯৮০ সালে। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবগণের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কয়েক মাস পরে এ দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আঞ্চলিক সহযোগিতার পাঁচটি বৃহত্তর ক্ষেত্র সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে এ সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের প্রথম বৈঠকের সময় সার্ক গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ৫টি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য Integrated Plan of Action (IPA) গ্রহণ করা হয়। এ পাঁচটি ক্ষেত্র হলো- কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, টেলি-যোগাযোগ, জলবায়ু এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম। পরবর্তীতে IPA এর সাথে আরও কয়েকটি বিষয় যুক্ত করা হয়। যথা- পরিবহন, ডাক যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেবা, ক্রীড়া, শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতি।



সার্ক দেশসমূহের মানচিত্র

সার্কের গঠন

সার্কের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর। এগুলো হলো - (১) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন (২) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন (৩) স্ট্যান্ডিং কমিটি (৪) টেকনিক্যাল কমিটি এবং (৫) সার্ক সচিবালয়। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। সংস্থার প্রধানকে বলা হয় সেক্রেটারি জেনারেল। প্রতি বছর সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রধানদের নিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রায় ১৫০ কোটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।



চিত্র: সার্ক সচিবালয়

সার্কের মূলনীতি

সার্কের মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ-

- এ সংস্থার যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে;
- দুটি দেশের মধ্যকার বিরোধ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা এ সংস্থায় আলোচনা করা যাবে না;
- সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক কল্যাণকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে দেখা হবে এবং
- এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য

- ১। সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;
- ২। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা;
- ৩। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ৪। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- ৫। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন;
- ৬। অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া;
- ৭। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা;
- ৮। দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা এবং
- ৯। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র

সার্কভুক্ত দেশগুলো নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ—

(১) কৃষি; (২) শিক্ষা ও সংস্কৃতি; (৩) খেলাধুলা; (৪) স্বাস্থ্য; (৫) জনসংখ্যা সংক্রান্ত কর্মতৎপরতা ও শিশু কল্যাণ, (৬) পরিবেশ ও আবহাওয়া; (৭) পল্লী উন্নয়ন; (৮) ট্যুরিজম বা পর্যটন; (৯) পরিবহন; (১০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং (১১) যোগাযোগ।

এসব প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপায় চিহ্নিত ও বাস্তবায়নের জন্য সাতটি দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কার্যকর দল গঠন করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

সার্কের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতা

উপরিলিখিত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর আওতায় বেশ কিছু কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়েছে। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

- ১। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৯৩ সালে সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ২। শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ছে। ফলে এক দেশের লোক সার্ক স্কলারশিপ ও শিক্ষা সুযোগের আওতায় অন্য দেশে লেখাপড়া ও গবেষণার সুযোগ পাচ্ছে।
- ৩। সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জন্য উচ্চতর ও গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য দিল্লিতে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি সার্কভুক্ত দেশগুলোর মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।
- ৪। সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে নিয়মিত সাফ গেইমস আয়োজন করা হয়।
- ৫। সার্ক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি সার্ক তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- ৬। সার্কভুক্ত দেশগুলোর যুবসমাজের মেধা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য SAARC Youth Award চালু করা হয়েছে। প্রতি বছর এ পুরস্কার দেওয়া হয়।
- ৭। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৮। এছাড়া মানবপাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরক্ষণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক রাষ্ট্র তাদের স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করতে পেরেছে বলেই নতুন নতুন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা জন্ম লাভ করছে। আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকলের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছে। কাজেই সার্কের সদস্য দেশসমূহ আন্তরিকভাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে সহযোগিতার হাত বাড়ালে তা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। সার্ক বিভিন্নভাবে অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর উন্নয়নে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থ নিয়ে কাজ করছে। যেমন—নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণ, সন্ত্রাস, শিশু ও নারী পাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তির সংকট, খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি। সার্ক এসব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এটাই সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের প্রত্যাশা।

অধ্যায় ১৫

জনসংখ্যা সচেতনতা

পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

জনসংখ্যা যেকোনো দেশের একটি মূল সম্পদ। তবে দেশের সার্বিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দেশে জনসংখ্যা যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয় তবে দেখা দেয় বহুবিধ সমস্যা। বর্তমান পৃথিবীতে জনসংখ্যা সমস্যা একটি বিশাল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ সমস্যাটি তীব্র আকার ধারণ করেছে। এসকল দেশগুলোতে জনসংখ্যা অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের এক হিসেব অনুযায়ী ৫০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটির মধ্যে ছিল। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত শত কোটি। এ বিপুল জনসংখ্যাকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৫০ সালের আগে উচ্চ মৃত্যুহারের প্রভাবে (বিশেষ করে শিশু মৃত্যু) পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম ছিল। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং খাদ্য ও পুষ্টি ক্ষেত্রের উন্নয়নের ফলে মৃত্যুহার কমে যাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ধারা নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো:

সারণী: পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

বছর/সাল	জনসংখ্যা
১	২০০ মিলিয়ন
১০০০	২৭৫ মিলিয়ন
১৫০০	৪৫০ মিলিয়ন
১৮০৪	১ বিলিয়ন
১৯২৭	২ বিলিয়ন
১৯৭৫	৪ বিলিয়ন
২০২৫	৮ বিলিয়ন

Source :

<http://geography.about.com/od/obtainpopulationdata/a/worldpopulation.htm>

May 11, 2011, "World Economic Outlook Database, October 2010". IMF.ORG.(Partially modified)

১ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২০০ মিলিয়ন। ১০০০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৭৫ মিলিয়ন। ১৫০০ সালে (পরবর্তী ৫০০ বছরে) উক্ত জনসংখ্যা বেড়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮০৪ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি। যা বেড়ে ১৯২৭ সালে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ১২৩ বছর। ১৯২৭ সালের উল্লেখিত ২ বিলিয়ন জনসংখ্যা বেড়ে ৪ বিলিয়ন হয়েছে ১৯৭৫ সালে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে মাত্র ৪৮ বছর। ১৯৭৫ সালের ৪ বিলিয়ন জনসংখ্যা বেড়ে ৮ বিলিয়ন হতে লাগবে ৫০ বছর (২০২৫ সাল)। উপরের পরিসংখ্যান থেকে এটি স্পষ্ট যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশি। World Economic Database এর হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ১৪০ জনেরও বেশি মানুষ বেড়ে

চলেছে। সে হিসেবে প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ৭০ মিলিয়নের উপর। ফলে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে ব্যাপক প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যা, যেমন-মরুত্ব, বন্যা, জলাবদ্ধতা, সুপেয় পানির অপরিাপ্ততা, বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি, বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য, পানিদূষণ, ট্র্যাফিক জ্যাম, উগ্রতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বাধীনতা খর্ব ইত্যাদি। বিভিন্ন অপরামূলক আচরণ ক্রমাগত পরিস্থিতিতে আরো ভয়াবহ করে তুলছে। বর্তমান পৃথিবীতে দুই বিলিয়ন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এছাড়া অনেক মানুষ নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

সারণী: জনসংখ্যা ভিত্তিক পৃথিবীর ২০ টি দেশ (উচ্চ থেকে নিম্নক্রম অনুসারে)

ক্রমিক নং	দেশ	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব	পৃথিবীর জনসংখ্যার %	নগর জনসংখ্যা %
১.	চীন	১৪১ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯২৮	১৫১	১৮.৫	৫৮
২.	ভারত	১৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৫৪	৪৫৫	১৭.৭	৩২
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৪৮	৩৬	৪.৩	৮৩
৪.	ইন্দোনেশিয়া	২৬ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৮০	১৪৭	৩.৫	৫৪
৫.	ব্রাজিল	২১ কোটি ০৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৫৪	২৫	২.৮	৮৪
৬.	পাকিস্তান	২০ কোটি ০৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৮১৮	২৬০	২.৬	৩৮
৭.	নাইজেরিয়া	১৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৩৭	২১৫	২.৬	৪৯
৮.	বাংলাদেশ	১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৪৯	১২৭৮	২.২	৩৫
৯.	রাশিয়া	১৪ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭০৯	০৯	১.৯	৭৩
১০.	মেক্সিকো	১৩ কোটি ০৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ০৭৪	৬৭	১.৭	৭৮
১১.	জাপান	১২ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৩২	৩৪৯	১.৭	৯৪
১২.	ইথোপিয়া	১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৮২	১০৮	১.৪	২০
১৩.	ফিলিপাইনস	১০ কোটি ৬৫ লক্ষ ১২ হাজার ০৭৪	৩৫৭	১.৪	৪৪
১৪.	মিশর	০৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৪১	১০০	১.৩	৩৮
১৫.	ভিয়েতনাম	০৯ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯১ হাজার ১৪৬	৩১১	১.৩	৩৪
১৬.	ডি আর কংগো	০৮ কোটি ৪০ লক্ষ ০৪ হাজার ৯৮৯	৩৭	১.১	৩৯
১৭.	জার্মানি	৮ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৫৭	২৩৬	১.১	৭৬
১৮.	ইরান	০৮ কোটি ২০ লক্ষ ১১ হাজার ৭৩৫	৫০	১.১	৭৪
১৯.	তুরস্ক	০৮ কোটি ১৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৭১	১০৬	১.১	৭১
২০.	থাইল্যান্ড	০৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৮২ হাজার ১৭৩	১৩৫	০.৯	৫২

Source : <http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>, <http://www.worldometers.info/population/most-populous-countries/#past>

সারণী : জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্কভুক্ত দেশসমূহ (উচ্চ থেকে নিম্নক্রম) অনুসারে

ক্রমিক নং	দেশ	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব	পৃথিবীর জনসংখ্যার %	নগর জনসংখ্যা %	মাথাপিছু জিএনআই (পিপিপি) ইউএস ডলার (২০১৫)
১.	ভারত	১৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৫৪	৪৫৫	১৭.৭	৩২	৫,৬৬৩
২.	পাকিস্তান	২০ কোটি ০৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৮১৮	২৬০	২.৬	৩৮	৫,০৩১
৩.	বাংলাদেশ	১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৪৯	১২৭৮	২.২	৩৫	৩,৩৪১
৪.	আফগানিস্তান	৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৭৬	৫৬	০.৪৮	২৫	১,৮৭১
৫.	নেপাল	২ কোটি ৯৬ লক্ষ ২৪ হাজার ০৩৫	২০৭	০.৩৯	১৯	২,৩৩৭
৬.	শ্রীলঙ্কা	২ কোটি ০৯ লক্ষ ৫০ হাজার ০৪১	৩৩৪	০.২৭	১৯	১০,৭৮৯
৭.	ভুটান	৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৪	২১	০.০১	৩৯	৭,০৮১
৮.	মালদ্বীপ	৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৫৯	১৪৮১	০.০১	৪০	১০,৩৮৩

সারণী: মানব উন্নয়ন অবস্থান (উচ্চ থেকে নিম্নক্রম) ভিত্তিতে জনসংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য

ক্রমিক নং	দেশ	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব	নগর জনসংখ্যা %	মাথাপিছু জিএনআই (পিপিপি) ইউএস ডলার (২০১৫)
১.	নরওয়ে	৫৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৬৩	১৫	৭৯	৬৭,৬১৪
২.	অস্ট্রেলিয়া	২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭২ হাজার ২৪৭	৩	৮৯	৪২,৮২২
৩.	সুইজারল্যান্ড	৮৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ০৩৪	২১৬	৭৩	৫৬,৩৬৪
৪.	জার্মানী	৮ কোটি ২২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৫৭	২৩৬	৭৬	৪৫,০০০
৫.	ডেনমার্ক	৫৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৫৭	১৩৬	৮৭	৪৪,৫১৯
৬.	সিঙ্গাপুর	৫৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৯০১	৮২৭৪	১০০	৭৮,১৬২
৭.	নেদারল্যান্ডস	১ কোটি ৭০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৫৯	৫০৭	৯১	৪৬,৩২৬
৮.	আয়ারল্যান্ড	৪৮ লক্ষ ০৩ হাজার ৭৪৮	৭০	৬৪	৪৩,৭৯৮
৯.	আইসল্যান্ড	৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮০	৩	৯৬	৩৭,০৬৫
১০.	কানাডা	৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৬৫	৪	৮১	৪২,৫৮২
১০.	যুক্তরাষ্ট্র	৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৪৮	৩৬	৮৩	৫৩,২৪৫

Source : <http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>, <http://www.worldometers.info/population/most-populous-countries/#past>, <http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (৫৫,৬০০ বর্গমাইল)। এ হিসেবে আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০তম। অন্যদিকে সর্বশেষ আদমশুমারী (২০১১) অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। এ হিসেবে মোট জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটি বিশ্বের ৯ম

বৃহত্তম রাষ্ট্র ছিল। ২০১১ সনের আদমশুমারি হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে এগারতম (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৩য় শ্রেণি: পৃঃ৬৬)। হাতে গোনা কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ব্যতীত বাংলাদেশই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে জনঘনত্বপূর্ণ দেশ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ। পরবর্তীতে ১৯৮১ সাল থেকে নিয়মিত আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আদমশুমারি তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার চিত্র নিম্নরূপ।

আদম শুমারির সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯৩ লক্ষ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ

উপরের ছকটি লক্ষ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৩৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২%। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার গণনাকৃত বৃদ্ধির হার হচ্ছে ১.৫৬৬% এবং বর্তমান ধারা যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে পরবর্তী ৪৫ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা হবে প্রায় দ্বিগুণ। বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো।

(Source : CIA World Factbook, July 12, 2011)

বছর	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার
১৯০১	২.৮৯	০.৯০
১৯১১	৩.১৬	০.৯৪
১৯২১	৩.৩৩	০.৬০
১৯৩৪	৩.৫৬	০.৭৪
১৯৪১	৪.২০	১.৭০
১৯৫১	৪.১৯	০.৫০
১৯৬১	৫.৫২	২.২৬
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫
১৯৯১	১১.১৫	২.০৪
২০০১	১২.৯৩	১.৪৮
২০১১	১৪.২৩	১.২

সূত্র : মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪৩

জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে (আগস্ট ২০১৮) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৪৯। এ হিসেবে বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বর্তমানে পৃথিবীতে ৮ম স্থানে রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ১২৭৮ জন। এ দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে অন্যতম জনবহুল রাষ্ট্র।

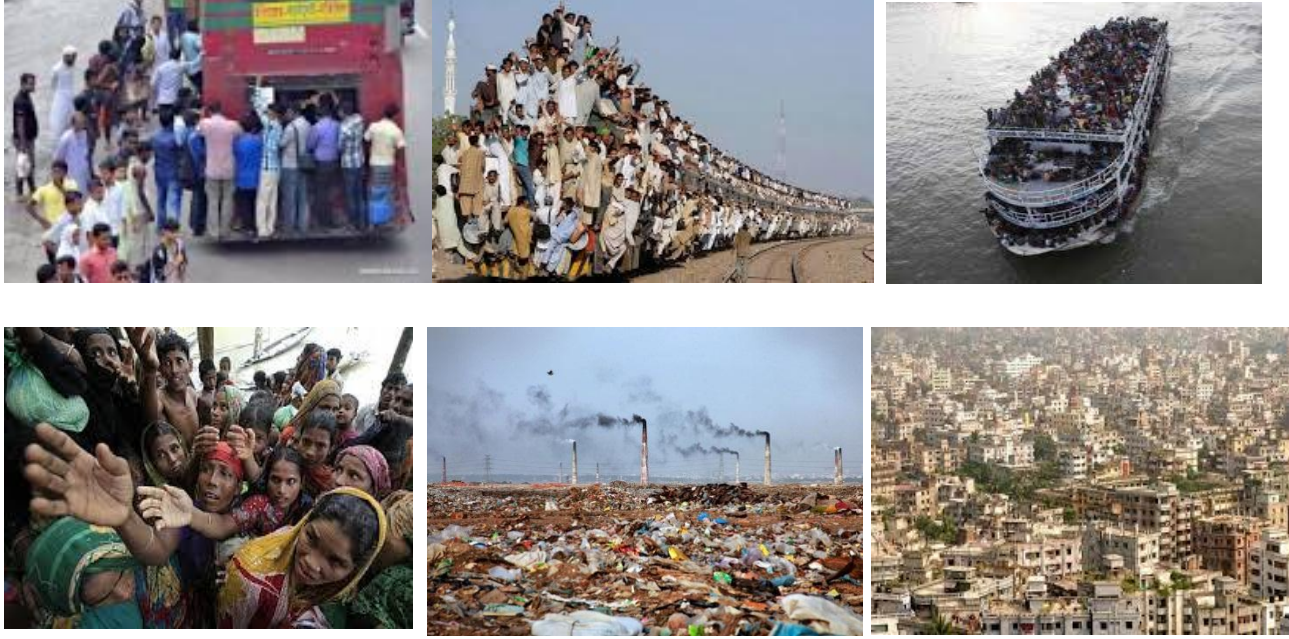
বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বেড়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে নানাবিধ কারণ। যেমন—

১. সামাজিক কারণ : বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কারণ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। যেমন: শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণে কম সুযোগ, নারীর ক্ষমতায়নের অভাব, পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় বারবার সন্তান জন্মদান ইত্যাদি।
২. অর্থনৈতিক কারণ : দারিদ্র্য ও নিম্ন জীবনমানের কারণে গুণগত মানসম্পন্ন জীবন সম্পর্কে অসচেতনতা, কৃষি ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক পেশার ওপর বেশিরভাগ মানুষের নির্ভরশীলতা, শিশুশ্রমের কারণে কম উপার্জনের কাজে নিয়োজিত হওয়া প্রভৃতি দেশে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।
৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সংক্রামক ও মহামারী রোগের প্রতিরোধ, প্রতিষেধক আবিষ্কার, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপদ পানির ব্যবহার স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির কারণে জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে শিশু ও প্রসূতি মায়ের মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪. কুসংস্কার : আমাদের দেশের মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফলের বিষয়ে অসচেতন বিধায় সহজেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে কেউ কেউ অধিক সন্তানকে আশীর্বাদ মনে করে। অনেকে আবার জন্ম নিয়ন্ত্রণকে পাপ মনে করে। তাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি বড় কারণ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

জনসংখ্যা যে কোন দেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কিন্তু দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেলে এবং এ অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারলে সেটি যে-কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার আধিক্য এদেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সরকারের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেছে।



উপরের চিত্রগুলো লক্ষ করি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করি

নিচের কেস স্ট্যাডিটি পড়ুন

শাওনদের পরিবার ঢাকায় থাকে। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৪ জন। অর্থনৈতিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ পরিবারটি আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ৪কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। ৩টি বেড়রুম এবং একটি ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। শাওনের মা-বাবা এক কক্ষে থাকে। আর বাকী ২টি কক্ষে ২ ভাইবোন থাকে। বাড়িতে দুটি বাথরুম একটি মা বাবার কক্ষের সাথে এবং অন্যটি দুই ভাইবোন ব্যবহার করে। শাওনের মা-বাবা চাকরিজীবী। যাতায়াতের সুবিধার্থে তারা একটি ছোট গাড়িও কিনেছে। শাওনের বাবা গাড়ি চালাতে পারে। তাই তারা চারজন কোথাও একত্রে বাইরে যেতে চাইলে একই গাড়িতে যেতে পারে। পরিবারের আয় দিয়ে স্বাভাবিকভাবে তাদের মাস চলে যায়। শাওনের মামাত বোন ঢাকার একটি কলেজে ভর্তি হয়ে শাওনদের বাসায় উঠেছে। শাওনের চাচাত ভাই মেডিকেল কলেজে ভর্তির কোচিং করার জন্য ঢাকায় এসে শাওনদের বাসায় বসবাস শুরু করেছে। বর্তমানে শাওনদের বাসার নিয়মিত লোকসংখ্যা ৬ জন। তদুপরি মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে আত্মীয় স্বজন ঢাকায় এসে কিছুদিন শাওনদের বাসায় অবস্থান করে। এতে শাওনদের জীবনযাত্রার উপর কীরূপ প্রভাব পড়বে ?

সম্ভাব্য সমস্যাগুলো হলো

- ❖ আর্থিক অনটন শুরু হবে।
- ❖ একই কক্ষে গাদাগাদি করে ২/৩ জনকে থাকতে হবে।
- ❖ লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হবে। বাথরুমে ভীড় লেগে যাবে।
- ❖ সকলে একত্রে ডাইনিং টেবিলে বসে খেতে পারবেনা।
- ❖ বাইরে যেতে চাইলে গাড়িতে সবাই চড়তে পারবেনা।

শাওনদের পরিবারের মতই একটি দেশের স্বাভাবিকের তুলনায় লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেদেশের ‘কী কী সমস্যা হতে পারে’ বিষয়টি চিন্তা করুন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যাধিক্য এবং অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে কোনো দেশের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় এবং এদেশের জনসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের মাথাপিছু আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অনেকের পক্ষে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে জনগণের দরিদ্রতার কারণে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কম হওয়ায় সরকারের পক্ষে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ব্যাহত হয়। এভাবে জনসংখ্যার অধিক চাপ আমাদের দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে।

নিম্নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট কয়েকটি সমস্যা বর্ণনা করা হলো-

১। খাদ্য সমস্যা

অতীতে একসময়ে বাংলাদেশ খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিক কৃষি কাজ প্রবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তার চেয়ে অধিক হওয়ায় বাংলাদেশে বরাবরই খাদ্য ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি কৃষিতে বিপ্লবের কারণে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হলেও কোন প্রাকৃতিক কারণে ফসল বিনষ্ট হলে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয়। পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের অভাবে এদেশের অনেক মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।

২। শিক্ষা সমস্যা

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষরতার হার আশানুরূপ বাড়ছে না। শিক্ষা খাতে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দের অভাবে বাড়তি জনসংখ্যার শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সার্বিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া পুষ্টিহীনতার কারণে মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ফলে শিশুরা দুর্বল, অসুস্থ, মেধাহীন ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। স্কুলের পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের দরুন স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ (এক তৃতীয়াংশ) এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। শিক্ষার সুফল সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারার কারণে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে শিশুশ্রমে নিয়োজিত করতে তারা সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা একটি চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সার্বিক ব্যবস্থা করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। পুষ্টিহীনতার কারণে অনেক শিশু দুর্বল, অসুস্থ, মেধাহীন ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। এদের অনেকে বিদ্যালয় থেকে ঝড়েও পড়ে।

৩। কৃষি জমি হ্রাস ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি

জনসংখ্যা স্ফীতির ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছে, যা কৃষি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। আবার বাড়তি জনসংখ্যার ঘরবাড়ি ইত্যাদির প্রয়োজনে কৃষি জমির পরিমাণ কমে কমে এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যা একজন লোকের খাদ্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপে ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৪। বেকারত্ব

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বেকারত্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৮৫ সালে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তির মোট ৩৮% বেকার ছিল। ১৯৮২ সালে যেখানে একটি পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২০ জন সেখানে ১৯৮৮ সালে এই সংখ্যা দাড়িয়েছে ১২৬ জনে। বর্তমানে ১৫ বছরের উর্ধ্বে বয়সী জনসংখ্যার প্রায় ৬ কোটি মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের যোগ্য (জনশক্তি) এদের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মে অনিয়োজিত (Unemployed) রয়েছে। তাদের কর্মসংস্থান আশু প্রয়োজন যেটি বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। (সূত্র: বিবিএস. পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ২০১৬)

৫। স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা

বাংলাদেশে পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উপর জনসংখ্যা স্ফীতির ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সরকারের পক্ষে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। প্রতি ৪০৪৩ জন মানুষের জন্য মাত্র ১জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক রয়েছেন। হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ প্রচণ্ড হলেও অনেকেই ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না। একজন ভাল চিকিৎসকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ পেতে মাসের পর মাস লেগে যায়। অপরদিকে পুষ্টিজ্ঞান ও পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্যের অভাবে অসংখ্য মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। কাজেই স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা, পুষ্টিজ্ঞানের অভাব এবং এসব সেবা প্রাপ্তির সামর্থ্যের অভাবে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর এর মূল উৎস মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা।

৬। বাসস্থান সমস্যা

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তদুপরি বাংলাদেশে দিন দিন যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাদের জন্য প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ নতুন গৃহের প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে কোনোভাবেই এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই দিন দিন বস্তিবাসী ও গৃহহীনের সংখ্যা বাড়ছে। জাতিসংঘের সূত্র মতে এ দেশে প্রায় ১০ লক্ষ লোক গৃহহীন অবস্থায় মানবতর জীবনযাপন করছে। জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। সেই সাথে জনগনের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বাসস্থান নির্মাণ এর ফলে দিন দিন কৃষিজমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

৭। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট ও পরিবেশ দূষণ

মানুষের বসবাসের উপযোগী প্রকৃতির নিজস্ব যে পরিবেশ রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তা আজ নানা কারণে দূষিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত। অতিরিক্ত লোকের চাহিদা মেটাতে দেশে দেখা দিয়েছে বিস্তৃত পানির সংকট। খাবারের বাড়তি চাহিদা মিটাতে জমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে সার ও কীটনাশক, যা পানি ও মাটি দূষিত করার সাথে সাথে জলজ প্রাণী ধ্বংস করে চলেছে। অতিরিক্ত যানবাহনের ব্যবহার বাতাসকে করেছে দূষিত। বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজনে অনেক সময় বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেই জায়গায় বাসস্থান নির্মাণ ও চাষের জমি তৈরি ও কাটা গাছপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছপালা কাটার ফলে ভূমিক্ষয় বেড়ে গিয়ে নদী ভরাট করে, ফলে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যায়। গাছপালার অভাবে এসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে মরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। অতিরিক্ত খাদ্যের চাহিদা মেটাতে জমিতে পানি সেচের প্রয়োজন বেড়ে যায়। মাটির নিচ থেকে পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নেমে যায়। এতে মাটি বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে যা মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকীস্বরূপ।

৮। সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধপ্রবণতা

বাংলাদেশের পক্ষে বিপুল জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যার ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না বলে সমাজে হতাশা, ক্ষোভ ও অস্থিরতা বাড়ছে। এই অভাব, অনটন, বেকারত্ব থেকে বিভিন্ন রকম অন্যায়, অত্যাচার ও নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং মাত্রাধিক্য জনসংখ্যাকে নির্দিধায় সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধপ্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ বলা যায়।

৯। শিল্পায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় কমে যাওয়ায় এ দেশে প্রয়োজনীয় পুঁজি গঠন করা যাচ্ছে না। তাছাড়া জনগণের মৌলিক চাহিদা পরিপূরণ করতেই জাতীয় আয়ের সিংহভাগ ব্যয় হয়ে যায়। পুঁজির অভাবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক অবক্ষয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট এটিই বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানতম সমস্যা।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান বাধা হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। সে কারণে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের কোন বিকল্প নেই। তাই একদিকে যেমন প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, তেমনি সাথে সাথে এ বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হলে দেশের উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। কাজেই জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের প্রধান দুটি উপায় হলো-(১) জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও (২) জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

- ১) **জন্ম নিয়ন্ত্রণ:** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো জন্ম নিয়ন্ত্রণ। বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায়গুলো নিম্নরূপ হতে পারে।

ক) **সচেতনতা সৃষ্টি :** জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করতে হবে। সেজন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গণশিক্ষা

কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল স্তরের বয়স্ক জনগণকে স্বাক্ষরতাসহ মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা ও এর সমাধানে ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে (নারীর স্বাস্থ্য ও পরিবারের আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সন্তান গ্রহণ করা) সচেতন করে তুলতে হবে।

খ) **জন্ম নিয়ন্ত্রণ সেবা ও সামগ্রী সহজলভ্য করা:** সরকারী ও বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থার উদ্যোগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সেবা ও সামগ্রী জনগণের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসমূহ সকলকে বিনামূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

গ) **শিশুমৃত্যু হার হ্রাস ও সকলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা:** সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করার মাধ্যমে শিশু ও প্রসূতিসহ সকলের মৃত্যুহার হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ) **কুসংস্কার দূরীকরণ:** অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামী ও ধর্মীয় অপব্যখ্যা জন্মনিয়ন্ত্রণের বড় বাধা। এসকল বাধা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সারকারি উদ্যোগে নিম্নোক্ত কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে।

ক. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও মৌলিক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করেছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

খ. সরকার নারীশিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করেছে।

গ. সকল নাগরিকের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। একই সঙ্গে পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঘ. শিশুবিবাহ তথা বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বহুবিবাহ হ্রাসের জন্য বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেছে।

ঙ. আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে।

চ. শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে।

ছ. জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাদেশে ‘জাতীয় জনসংখ্যা দিবস’ পালন করা হয়।

জ. জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশের শ্লোগান হচ্ছে, ‘দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়’। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদের কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প
- দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন
- বাল্যবিবাহ রোধ ও বিলম্বে বিবাহের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, টীকাদান ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- জনসংখ্যা মোকাবেলায় পোস্টার, নিউজ লেটার, ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শন ইত্যাদি সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা
- স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ইত্যাদি।

২. জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর : কোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। অতিরিক্ত এই জনসংখ্যাকে কেবল সমস্যা হিসেবে দেখলে হবে না, বরং তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। এতে একদিকে দেশের উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। অন্যদিকে জনসংখ্যা সমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে। বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করেছে। উদাহরণস্বরূপ চীনের কথা বলা যায়। আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত এবং শ্রীলংকাও এক্ষেত্রে বেশ সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের ২৩% ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

- কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা
- তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার
- দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ
- নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারীশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার
- উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ
- কৃষির আধুনিকীকরণ ও কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার।

জনসংখ্যা রোধে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের পাশাপাশি জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলে দেশের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সেজন্য উপরে বর্ণিত বিষয় সুবিবেচনায় রাখতে হবে। এই জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মনোভাব গঠনে একটি বহুখাতমুখী কৌশল অবলম্বন করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হলেও বাংলাদেশের প্রচলিত জনসংখ্যানীতিতে বিস্তৃত, দীর্ঘমেয়াদি ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাইলে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারও এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তবে কেবল সরকার নয়, আমাদের সবার এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তথ্যসূত্র এবং সহায়ক সামগ্রী

- Aggarwal, J. G. (1993). Teaching of Social Studies. New Delhi: Vikas Publishing House.
- Arends, R. I. (1994). Learning to Teach. New York: McGraw-Hill.
- Become a Social Studies Teacher. <http://www.alleducationschools.com>
- Barnett, Elizabeth, & Casper, Michele, (2001). A definition of “Social Environment”. American Journal of Public Health, 91(3).465.
- Darling-Hammond, L. & Bransford, J. (Eds.) (2005). Preparing for a Changing World-What Teachers Should Learn and be Able to do San, Francisco: Jossey-Bass, CA.
- de Melendez, W. R., Beck, V., & Fletcher, M. (2000). Teaching Social Studies in Early Education. Albany, NY: Delmar (Thomson Learning).
- Dhand, H. (1992). Research in Teaching Social Studies. New Delhi: Ashish Publishing House.
- Dean, J. (2009). Organizing Learning in the Primary School Classroom (4th ed.). New York: Routledge.
- Dynneson, T. L., & Gross, R. E. (1999). Designing Effective Instruction for Secondary Social Studies (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill, Prentice-Hall, Inc.
- Eby, J. W. (1992). Reflective Planning, Teaching, and Evaluation for the Elementary School. New York, NY: Macmillan Publishing Company.
- Educational Development Centre (1998), Environmental Studies Teachers’ Guide: Grade Five, Educational Development Centre, M Republic of Maldives.
- Gardner, H. (1983), Forms of mind: The Theory of Multiple Intelligencies. New York.
- Gess-Newsome, J., & Lederman, N. G. (Eds.) (2002). Examining Pedagogical Content Knowledge. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Higher Education Series (2002). Moral Education. KL: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.
- How to Teach Children about obeying rules. http://www.ehow.com/how_7722300_teach-children-obeying-rules.htm
- Islam Sirajul (1999) (Ed.) . History of Bangladesh (3 vols.). Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh (1704-1971).

Jarolimek, (1990). Social Studies for citizens of a strong and free nation. In Social studies curriculum planning resources. Washington, DC: National Council for the Social Studies).

J.C. Aggarwal (1993). Teaching of Social Studies A Practical Approach, Vikas Publishing House, New Delhi.

Janet Alleman and Jere Brophy (nd). Current Trends and Practices in Social Studies Assessment for the Early Grades, NCCS.

James A. Duplass (2008). Teaching Elementary Social Studies: Strategies, Standards, and Internet Resources, New York: Wadsworth Cengage Learning.

Kochar, S. K. (1983). Teaching of Social Studies. Kolkata: Sterling Publishers Private Limited.

Kochar S. K. (1993). Teaching of Social Studies, Streling Publishing Private Limited, New Delhi

Kumary, B. Veena, & Rao, Digumarty Bhoskara (2004). Methods Of Teaching Social Studies. New Delhi: Discovery Publishing House.

Lerner, J. W., & Johns, B. (2009). Learning Disabilities and Related Mild disabilities: Characteristics, Teaching Strategies, and New Directions (11th ed.). Boston, New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

Lesson Plans.html. Lesson Plans and Teaching Strategies, Lesson Plans.html

Levstik, L. S., & Tyson, C. A. (Eds.), (2008). Handbook of Research in Social Studies Education. New York: Routledge.

Linda S. Levstik and Cynthia A. Tyson (2008). Handbook of Research in Social Studies Education. Routledge, NY.

Loughran, J. J. (1996). Developing Reflective Practice: Learning about Teaching and Learning through Modelling. London, Washington, D. C.: Falmer Press.

McCoy, K. M. (2009). Strategies for Teaching Students with Special Needs – Methods and Techniques for Classroom Instruction. Denver, Sydney, London: Love Publishing Company.

McKernan, J. (2008). Curriculum and Imagination – process, theory, pedagogy and action research. London and New York: Routledge.

Mclendon, J. C. (1965). Social Studies in Secondary Education. New York: The Macmillan Company.

Nelson, K. (1998). Developing Students' Multiple Intelligencies. New York: Scholastic.

Oliner, P. M. (1976). Teaching Elementary Social Studies – A Rational and Humanistic Approach.

New York, Chicago: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

O'Malley Fran (2008). Index of Strategies for Teaching Social Studies.

Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice-Hall, Inc.

Sharma, R. K. (2007). Teaching of Social Studies. New Delhi: Lotus Press.

Saha, L., J., & Dworkin, A. G. (2009). International Handbook of Research on Teachers and Teaching (part 1 & 2). (Eds.). New York: Springer.

Seefeldt, C. (2005). Social Studies for the Preschool/Primary Child (7th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice-Hall, Inc.

Shaver, J. P. (Ed.), (1991). Handbook on Research of Social Studies – Teaching and Learning (A project of the National Council for the Social Studies). New York: Macmillan Publishing Company.

Strategies for Teaching Social Studies, <http://www.udl.edu/dssep/strategies.html>

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.

Shulman, L. S. (1986b). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Taylor, R. L., Smiley, L. R., & Richards, S. B. (2009). Exceptional Students – Preparing for the 21st Century. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Virginia S. Wilson, James A. Little and Gerald Lee Wilson (1993). Teaching Social Studies: Handbook of Trends, Issues, and Implications for Future. New York: Greenwood Publishing Group.

Wolfgang, C. H. (2005). Solving Discipline and Classroom Management Problems – Methods and models for today's teachers. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Zinnah, M. A. (2010). Social Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge: A Case Study at General Secondary School level in Bangladesh. Unpublished Doctoral dissertation, Penang, Malaysia: The School of Educational Studies, University Sains Malaysia.

Rashid Haroun ER (1991), Geography of Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh

Ain-O-Shalish Kendra. (2009). Human Rights in Bangladesh 2008, Dhaka: Ain-O-Shalish Kendra.

National Human Rights Commission, (2009), National Human Rights Commission Act 2009, Retrieved on November 27, from www.nhrc.org.bd/pdf/nhpc%20act%202009_L.pdf

National Human Rights Commission (2010a). Annual Report 2010

National Human Rights Commission (2010b) Regional Seminar on National Human Rights Commission in the Asia Pacific. Retrieved on November 27, from www.nhrc.org.bd/pdf/regsemrpt.doc%20annex6.pdf

National Human Rights Commission, (2011), Strategic Plan-2010-2015. Retrieved on November 27, from www.nhrc.org.bd/pdf/human%20rightsStrategicplan.pdf

আহমেদ, এমাজউদ্দিন. (২০০৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., ঢাকা।

আহমেদ, এমাজউদ্দিন (২০০০), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন।

আহসান, মো. শামীম. কূটনীতিকোষ, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

আকন, আ. সালাম; আলী, মো. তাবারক এবং শহিদ উল্লাহ. সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

আজার, সেলিনা; খান, নাসিমা; বেগম, সৈয়দা ফেরদৌসি; সরকার, হীরামন এবং রায়, রঙ্গলাল (২০০৫), প্রাথমিক শিক্ষা পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আহমেদ, নাসিরউদ্দিন ও তারেক, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) (১৯৯৩), উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, বাংলা

আলী মাসুদ ও আলম, নূরুল (১৯৯৩), বাংলাদেশের অর্থনীতি কাঠামো ও উন্নয়ন, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা

আলম, খুরশিদ (১৯৯৬), সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল. স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (২০০৩), বাংলাপিডিয়া-বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ৫ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৩৯-২৫৪।

ইসলাম, মো. নূরুল (২০১০), বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল (১৯৯৮), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল (১৯৯৮), স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১ম, ২য় ও ৩য় পত্র), হাসান বুক হাউজ, ঢাকা

ইসলাম, মফিজুল (১৯৭৭), রাষ্ট্রতত্ত্ব, ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো, ঢাকা

এম. আর. আখতার মুকুল সম্পাদিত (১৯৮৮)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, এক খণ্ডে সংক্ষেপিত।

এন সি টি বি, মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান, এন সি টি বি, ঢাকা।

কামাল, মোস্তফা (১৯৮৭), ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন : ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.

করিম, আব্দুল (১৯৭৭), বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.), ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী।

করিম, নাজমুল (১৯৯৯), সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

কাদির, মোহাম্মদ নূরুল (১৯৯৭), দুশো ছেষত্রি দিনে স্বাধীনতা, সিটি পাবলিশিং হাউজ লি. ঢাকা।

খান, কে. এম. রাইজউদ্দীন (১৯৯৬), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা. ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।

খান, আব্বাস আলী (১৯৯৬), বাংলাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর, পৃ. ১৫৩।

ঘোষ, নির্মল কান্তি (১৯৯২), আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা

চক্রবর্তী, হিমাচল (অনুবাদ, মূল : টম বটোমের), (১৯৯৫), সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা

চৌধুরী, আব্দুল মমিন, রহমান, মোকাদ্দেসুর, ও আলম, আকসাদুল (২০০১), উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাস (অর্থ সভ্যতা থেকে ১৫২৬), গাজীপুর, ঢাকা, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ, প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ (১৯৮৫), সমাজবিজ্ঞান শব্দশেষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১১), উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল, দ্বিতীয় পত্র। ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি.।

চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, আলী, মুহম্মদ আনসার, রহমান, লুৎফর ও বেগম, নাজনীন (২০১০), সামাজিক বিজ্ঞান (সপ্তম শ্রেণি), ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জোয়ারদার, সুবেশ চন্দ্র (২০০৬), বাংলাদেশের অর্থনীতি, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ঢাকা দে, মনোরঞ্জন, জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা বিশ্লেষণ, ফেমাস পাবলিকেশন্স, ঢাকা। ডুইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ (১৯৯৭), আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লি., ঢাকা। লতিফ, আবু হামিদ; হক, মো. মোজাম্মেল; আকন, আ. সালাম; হোসেন, মোকাদ্দেস (২০০০), সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। মন্ডল, রেবা ও মন্ডল, শাহজাহান (১৯৯৯), মানবাধিকার আইন, সংবিধান, ইসলাম ও এনজিও, ঢাকা : আলম বুক হাউস। মদিনা, কাজী, মালেক, আব্দুল, আক্তার, সেলিনা, মরিয়ম, মেহের ও জব্বার, মুহাম্মদ আব্দুল (২০০৩), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; আক্তার, সেলিনা; মরিয়ম, মেহের এবং জব্বার, মুহাম্মদ আব্দুল (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-তৃতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; মো. সুজা-উদ-দৌলা এবং মরিয়ম, মেহের (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজচতুর্থ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

মদিনা, কাজী, মালেক, আব্দুল, সুজা-উদ-দৌলা, মো. ও মরিয়ম, মেহের (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; মো. সুজা-উদ-দৌলা এবং মরিয়ম, মেহের (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজচতুর্থ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; আক্তার, সেলিনা; মরিয়ম, মেহের এবং জব্বার, মুহাম্মদ আব্দুল (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-তৃতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। মালেক, আব্দুল (২০০০), সামাজিক শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। মারুফা, কাজী (২০১০), বাংলাদেশ একটি ভৌগোলিক সমীক্ষা, ঢাকা : সুজনেষু প্রকাশনী। মাহমুদ সৈয়দ আলম (২০০৬), বাংলাদেশের অর্থনীতি, বই বিতান, ঢাকা। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ৩, ২০১১।

বেগম, রওশন আরা, শিকদার, আব্দুল হাই ও দাস, ক্ষণদা মোহন (২০০৯), মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। রউফ, কাজী আবদুর ও মাহমুদ, কাজী আবুল (২০১০), ফলিত ও ব্যবহারিক ভূগোল। ঢাকা : সুজনেষু প্রকাশনী। রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১০), সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা : হাসান বুক হাউস। রহমান, মোহাম্মদ আরিফুর (২০১০), অর্থনৈতিক ভূগোল। ঢাকা : পারফেক্ট পাবলিকেশন্স। রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০০২), সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা। রশিদ, মো. হারুন অর; চক্রবর্তী, শুভাশীষ; ধর, উত্তম কুমার এবং মুখার্জী, নিরেশ চন্দ্র, (হফ), বহুমুখী মূল্যায়ন শিক্ষক সহায়িকা, এনসিটিবি, ঢাকা। রহিম, এম.এ. (১৯৭৬), বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা : ইস্টার্ন প্রিন্টিং পাবলিশিং অ্যান্ড প্যাকেজেস লিমিটেড (নূরজাহান রহিম কর্তৃক প্রকাশিত)।

রহিম, মোহাম্মদ, চৌধুরী, আব্দুল মমিন, মোহাম্মদ, এ বি এম, ইসলাম, সিরাজুল (১৯৯৮), বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান। রহিম, এম. এ. (১৯৯৪), বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১১), প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১১, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১১), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। সুলতানা, সাবিহা; জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী; আক্তার, সেলিনা এবং রহমান, লুৎফুর (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-পঞ্চম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সেন, রঙ্গলাল (১৯৯৭), সমাজকাঠামো : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, নিউ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, মুখোপাধ্যায়, মতিলাল ও বসু মৃণ্ময়, (১৯৯৭), সমাজ দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিকেশন্স, কলকাতা।

সেন, রঙ্গলাল, নাথ, বিশ্বম্ভর কুমার (২০০৩), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, নিউ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা। সেন, রঙ্গলাল ও নাথ, বিশ্বম্ভর কুমার (২০০৭), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স। সুলতানা, সাবিহা; জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী; আক্তার, সেলিনা এবং রহমান, লুৎফুর (২০১১), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-পঞ্চম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। সিংহ, রামকান্ত (২০০১), বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। সাগর, খুরশিদ আলম (২০০৬), বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা। সুলতানা, রেবেকা; বেগম, মাকসুদা এবং উদ্দিন, ইমতিয়াজ (২০০৯), বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান, ওয়াইড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

হক, মোহাম্মদ লুৎফুল ও রহমান, মোস্তাফিজুর (১৯৯৭), বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ঢাকা। হক, মোহাম্মদ লুৎফুল ও রহমান, মোস্তাফিজুর (১৯৯৮), আধুনিক অর্থনীতি (ব্যক্তি ও সমষ্টিক অর্থনীতি), বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ঢাকা।

খান, মো: আব্দুল আওয়াল ও আকতার, খুরশীদ (২০০০), ভূগোল শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল (২০১৩), রাষ্ট্র বিজ্ঞান, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা

মালেক, আব্দুল ও খান, মো: লুৎফুর রহমান (২০০০), সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ও অন্যান্য (১৯৯৮), বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

হোসেন, আশফাক (২০১২), বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা, জে.কে.প্রেস এন্ড পাব্লিকেশন্স, ঢাকা